দ্বিতীয় অধ্যায়

আকায়েদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলেমা তাইয়েবায় আহলে সুন্নতের আকীদা

প্রকাশ থাকে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌- এ কলেমার সাক্ষ্য দেয়া ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে একটি স্তম্ভ। এর প্রথম বাক্যে তওহীদ এবং দ্বিতীয় বাক্যে রেসালত বিধৃত হয়েছে। প্রথম বাক্য কয়েকটি বিষয় জানা উচিত।

প্রথম ঃ একত্ববাদ; অর্থাৎ একথা জানা যে, আল্লাহ্‌ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি একক, তাঁর মত কেউ নেই। তিনি অমুখাপেক্ষী, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি চিরন্তন, যাঁর কোন শুরু নেই। তিনি সদা প্রতিষ্ঠিত, যাঁর কোন শেষ নেই। তিনি সদা বিদ্যমান, যাঁর কোন অবসান নেই। তিনি অক্ষয়, যাঁর কোন ক্ষয় নেই। তিনি মাহাত্ম্যের গুণাবলী দ্বারা সদা গুণান্বিত রয়েছেন এবং সদা থাকবেন। তিনিই সবার প্রথম এবং সবার শেষ। তিনিই জাহের এবং তিনিই বাতেন।

দ্বিতীয় ঃ পবিত্রতা ; অর্থাৎ, এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা'আলা সাকার নন, সীমিত পদার্থ নন, পরিণামবিশিষ্ট নন এবং বিভাজ্য নন। তিনি দেহের অনুরূপ নন, নিজে পদার্থ নন এবং কোন পদার্থ তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্টও নয়। তি আর্‌য নন; অর্থাৎ অন্যের উপর ভর দিয়ে কায়েম নন এবং অন্যের উপর ভর দিয়ে যা কায়েম থাকে, তা তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্টও নয়। কোন বিদ্যমান বস্তুর অনুরূপ তিনি নন এবং কোন বিদ্যমান বস্তুও তাঁর মত নয় । না তাঁর সমতুল্য কেউ আছে এবং না তিনি কারও অনুরূপ । কোন পরিমাণ তাঁকে সীমিত করতে পারে না এবং কোন দিকও তাঁকে বেষ্টন করে রাখতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবী তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না। তিনি আরশের উপর এমনভাবে অবস্থিত যেমন তিনি নিজে বলেছেন এবং যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেছেন। অর্থাৎ, তিনি আরশ স্পর্শ করা, তার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া, অবস্থান নেয়া, তাতে অনুপ্রবেশ করা এবং স্থানান্তরিত হওয়া থেকে পবিত্র । আরশ তাঁকে বহন করে না, বরং আরশ ও আরশ বহনকারীদেরকে তাঁর কুদরত বহন করে রেখেছে। সবকিছুই

তাঁর কুদরতের আওতাভুক্ত। তিনি আরশ, আকাশ এবং পৃথিবীর সীমানা পর্যন্ত সবকিছুর উপরে। তিনি এভাবে উপরে যে, আরশেরও নিকটে নন এবং পৃথিবী থেকেও দূরে নন। বরং তাঁর মর্যাদা এসব নৈকট্য ও দূরত্বের অনেক উর্ধ্বে । এতদসত্ত্বেও তিনি প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুর সন্নিকটে এবং বান্দার ধমনীর চেয়েও নিকটবর্তী । কেননা, তাঁর নৈকট্য দেহের নৈকট্যের অনুরূপ নয়, যেমন তাঁর সত্তা দেহের সত্তার অনুরূপ নয়। তিনি কোন বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন না এবং কোন বস্তু তাঁর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে না। কোন স্থান তাঁকে বেষ্টন করবে তিনি এ বিষয়ের উর্ধ্বে, যেমন তিনি সময়ের বেষ্টনী থেকে মুক্ত । তিনি স্থান ও কালের জন্মের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন । তিনি এখনও তেমনি আছেন যেমন পূর্বে ছিলেন। তিনি নিজ গুণাবলীতে সৃষ্টি থেকে আলাদা। তাঁর সত্তায় তিনি ব্যতীত অন্য কেউ নেই এবং অন্য কোন কিছুতেই তাঁর সত্তা নেই। তিনি পরিবর্তন ও স্থানান্তর থেকে পবিত্র। তিনি আপন মাহাত্ম্যের গুণাবলীতে ক্ষয় ও পতন থেকে সর্বদা মুক্ত। তিনি গুণাবলীর পূর্ণতায় কোন সংযোজনের প্রয়োজন রাখেন না। বিবেক দ্বারাই তাঁর অস্তিত্ব আপনা আপনি জানা হয়ে যায় । জান্নাতে সৎকর্মপরায়ণদের প্রতি তাঁর নেয়ামত ও অনুগ্রহ এই হবে যে, দীদার বা দর্শনের আনন্দ পূর্ণ করার জন্যে তিনি আপন সত্তা চর্মচক্ষে দেখিয়ে দেবেন।

তৃতীয় ঃ জীবন ও কুদরত। অর্থাৎ, এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা জীবিত, ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী। ক্লান্তি, অবসাদ, অসাবধানতা, নিদ্রা ও ক্ষয় তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর মৃত্যু নেই। আকাশ ও পৃথিবীর সাম্রাজ্য তাঁরই। আধিপত্য, ইযযত, সর্বশক্তিমত্তা, সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই। আকাশমণ্ডলী তাঁর ডান হাতে আবদ্ধ এবং সকল সৃষ্টি তাঁর মুঠোর মধ্যে পতিত। সৃষ্টি ও আবিষ্কারে তিনি স্বতন্ত্র ও একক। মানুষ ও তাদের ক্রিয়াকর্ম তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের রিযিক ও মৃত্যু নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কোন কিছু তাঁর কুদরতের বহির্ভূত নয়। তাঁর কদুরতের বস্তুসমূহ অগণিত এবং তাঁর জানা বিষয়সমূহের কোন শেষ নেই।

চতুর্থ ঃ এলেম অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন এটা জানা। পাতাল থেকে নিয়ে আকাশের উপর পর্যন্ত যা কিছু হয়, সবই তাঁর নখদর্পণে। আকাশ ও পৃথিবীর কোন অণু পরমাণু তাঁর কাছে গোপন নয়,

বরং গভীর কালো রাতে কালো পাথরের উপর একটি কালো বর্ণের পিপীলিকার ধীর পদক্ষেপ এবং বায়ুর অভ্যন্তরে ধূলিকণার গতিবিধ সম্পর্কেও তিনি সুপরিজ্ঞাত। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জেনে নেন এবং অন্তরের কুমন্ত্রণা, খটকা ও গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। তাঁর এলেম নিত্য ও অনন্ত। তিনি অনন্তকাল থেকে এই এলেম গুণে গুণান্বিত আছেন। তাঁর এলেম তাঁর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেনি এবং স্থানান্তর দ্বারা নতুন সৃষ্ট হয়নি।

পঞ্চম ঃ ইচ্ছা অর্থাৎ, এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা এ জগতকে ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টি করেছেন এবং নব নব সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা তিনিই করেন। তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তা হয়েছে এবং যা ইচ্ছা করেননি তা হয়নি। চোখের নিমেষ অথবা কোন আকস্মিক বিপদ আসা তাঁর ইচ্ছার বাইরে নয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাঁর আদেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই এবং তাঁর সিদ্ধান্ত মুলতবীকারীও কেউ নেই। তাঁর তওফীক ও রহমত ছাড়া বান্দার জন্যে নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই এবং তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে এবাদত ও আনুগত্যের কারও শক্তি নেই। যদি সমস্ত মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও শয়তান একত্রিত হয়ে বিশ্বের কোন একটি পরমাণুকেও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুজ্ঞা ছাড়া গতিশীল অথবা স্থিতিশীল করতে চায়, তবে কখনও তারা তা পারবে না। তাঁর ইচ্ছা গুণও অন্য সকল গুণের ন্যায় তাঁর সত্তার সাথেই প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি অনন্তকাল থেকে এসব গুণে গুণান্বিত। তিনি যখন যে বস্তু হওয়ার ইচ্ছা অনন্তকালের মধ্যে করেছেন, ঠিক তখনই অগ্র-পশ্চাত ব্যতিরেকে তা হয়েছে। তাঁর কোন অবস্থা অন্য অবস্থা থেকে অমনোযোগী করে না।

ষষ্ঠ ঃ শ্রবণ ও দর্শন। অর্থাৎ, এরূপ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। কোন শ্রাব্য বস্তু যতই গোপন, কোন দ্রষ্টব্য বস্তু যতই সূক্ষ্ম হোক, তাঁর শ্রবণ ও দর্শন থেকে অব্যাহতি পায় না। কোন দূরত্ব কিংবা অন্ধকার তাঁর শ্রবণের পথে প্রতিবন্ধক হয় না। তিনি দেখেন, কিন্তু চক্ষু কোটর ও পলক থেকে তিনি মুক্ত, তিনি শুনেন; কিন্তু কর্ণকুহর থেকে পবিত্র। কেনা, তাঁর পবিত্র সত্তা যেমন সৃষ্টির সত্তার মত নয়, তেমনি তাঁর গুণাবলী সৃষ্টির গুণাবলীর অনুরূপ নয়।

সপ্তম ঃ কালাম অর্থাৎ, এটা জানা যে, আল্লাহ তাআলা কালাম

করেন। সত্তার সাথে কায়েম তাঁর নিত্য ও অনন্ত কালাম দ্বারা তিনি আদেশ, নিষেধ, অঙ্গীকার ও শাস্তির কথা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কালাম সৃষ্টির কালামের মত নয় যে, বায়ু থেকে অথবা বস্তুর আঘাত থেকে আওয়াজ হবে অথবা জিহ্বার নড়াচড়া ও ঠোঁটের মিল থেকে উচ্চারণ সৃষ্টি হবে; বরং তাঁর কালাম উপসর্গ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কোরআন, তওরাত, ইনজীল ও যবুর তাঁর গ্রন্থ, যা তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআন পাকের তেলাওয়াত মুখে হয়, পত্রে লিখিত হয় এবং অন্তরে হেফয করা হয়; এতদসত্ত্বেও কোরআন নিত্য এবং আল্লাহ তাআলার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কাছ থেকে আলাদা হয়ে পত্রে স্থানান্তরিত হতে পারে না। মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার কালাম কণ্ঠস্বর ও অক্ষর ব্যতিরেকে শ্রবণ করেছেন।

অষ্টম ঃ ক্রিয়াকর্ম অর্থাৎ, এরূপ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু বিদ্যমান, তা সবই তাঁর কর্ম দ্বারা সৃষ্ট এবং তাঁরই ন্যায়বিচার থেকে কল্যাণপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা আপন ক্রিয়াকর্মে প্রজ্ঞাময় এবং আপন বিধি-বিধানে ন্যায়বিচারক। তাঁর ন্যায়বিচার বান্দার ন্যায়বিচার দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। কেননা, বান্দা জুলুম করতে পারে, অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করতে পারে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে জুলুম কল্পনাও করা যায় না। কেননা, তিনি অন্যের মালিকানা লাভ করেন না। মোট কথা, তিনি ব্যতীত যত মানুষ জ্বিন, ফেরেশতা, শয়তান, আকাশ, পৃথিবী, জীবজন্তু, লতাপাতা, জড় পদার্থ, অজড় পদার্থ, উপলব্ধ ও অনুপলব্ধ বস্তু রয়েছে, সবই তিনি আপন কুদরতের দ্বারা নাস্তি থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। অনন্তকালে তিনি একাই বিদ্যমান ছিলেন। এরপর স্বীয় কুদরত প্রকাশ এবং পূর্ব ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার উদ্দেশে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির কোন প্রয়োজন ছিল না। একান্ত কৃপাবশেই তিনি সৃষ্টি করেন। এগুলো তাঁর উপর অপরিহার্য নয়। সুতরাং কৃপা, অনুগ্রহ ও নেয়ামত তাঁরই জন্যে শোভনীয়। কারণ, তিনি বান্দাদেরকে নানারকম আযাব ও বিপদাপদে ফেলে দিতে সক্ষম ছিলেন। এটাও তাঁর জন্যে ন্যায়বিচার হত, জুলুম হত না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে আনুগত্যের বিনিময়ে সওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটা তাঁর জন্যে অপরিহার্য ছিল কারণে এ প্রতিশ্রুতি দেননি। কেননা, কারও জন্যে কোন কিছু করা তাঁর উপর ওয়াজেব নয়। তাঁর কাছে কারও কোন

ওয়াজেব প্রাপ্য নেই। কিন্তু মানুষের উপর তাঁর আনুগত্য অবশ্য প্রাপ্য রয়েছে, যা তিনি তাঁর পয়গম্বরগণের বাচনিক ওয়াজেব করেছেন। কেবল বিবেকের দৃষ্টিতে ওয়াজেব করেননি; বরং তিনি রসূল প্রেরণ করেছেন এবং প্রকাশ্য মোজেযার মাধ্যমে তাঁদের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। তাঁরা আল্লাহর আদেশ নিষেধ, প্রতিশ্রুতি ও শাস্তিবাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন। তাই রসূলগণকে সত্য জ্ঞান করা এবং তাঁদের আনীত বিধি-বিধান মেনে চলা মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য।

এখন দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ অর্থাৎ, রেসালতের সাক্ষ্য দেয়ার কথা শুন। এটা বিশ্বাস করা উচিত, আল্লাহ তা'আলা নবীয়ে উম্মী কোরায়শী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আরব, আজম, জ্বিন ও মানবের প্রতি রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর শরীয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী সকল শরীয়ত রহিত করেছেন। তবে যেগুলো তিনি বহাল রেখেছেন সেগুলো ভিন্ন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সকল পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং সকল মানুষের নেতা করেছেন। আল্লাহ তাআলা কেবল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তথা তওহীদের সাক্ষ্য দেয়াকেই পূর্ণ ঈমান সাব্যস্ত করেননি, বরং এর সাথে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ তথা রসূলের রেসালতের সাক্ষ্যও জুড়ে দিয়েছেন। তিনি ইহকাল ও পরকালের যেসব বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, সেগুলো মানুষের জন্যে অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এ সমুদয় বিষয়েই তাঁকে সত্যবাদী মনে করতে হবে। আল্লাহ তাআলা কোন বান্দার ঈমান কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে মৃত্যু পরবর্তী অবস্থাসমূহের প্রতি বিশ্বাস করে, যার সংবাদ মুহাম্মদ (সাঃ) দিয়েছেন।

এসব অবস্থার মধ্যে প্রথম মুনকার ও নকীরের প্রশ্ন। মুনকার ও নকীর দু'জন ভয়ংকর আকৃতির ফেরেশতা। তাঁরা কবরে বান্দাকে আত্মা ও দেহ সহকারে সোজা বসিয়ে দেয় এবং তাকে তওহীদ ও রেসালত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁরা বলেন ঃ তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? তাঁরা উভয়েই কবরের পরীক্ষক। মৃত্যুর পর প্রথম পরীক্ষা হয় তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ।

দ্বিতীয়, কবরের আযাব নিশ্চিত বিশ্বাস করতে হবে। এ আযাব প্রজ্ঞা ও ন্যায়বিচার সহকারে আত্মা এবং দেহ উভয়ের উপর যেভাবে আল্লাহ চাইবেন হবে।

তৃতীয়, মীযান তথা মানদণ্ড সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এর দু'টি পাল্লা হবে এবং প্রত্যেক পাল্লা আকাশ ও পৃথিবীর স্তরসমূহের সমান বৃহদাকার হবে। তাতে আল্লাহ তাআলার কুদরতে আমলসমূহ ওজন করা হবে। সেদিন বাটখারা কণা ও সরিষা পরিমাণে হবে, যাতে ন্যায়বিচার যথার্থই পূর্ণ হয়। সৎ আমলনামা সুন্দর আকারে নূরের পাল্লায় রাখা হবে এবং এসব নেক আমলের মর্তবা আল্লাহর কাছে যত বেশী হবে, ততই আল্লাহর কৃপায় পাল্লা ভারী হবে। মন্দ আমলনামা বিশ্রী আকারে অন্ধকার পাল্লায় রাখা হবে এবং আল্লাহ তাআলার ন্যায়বিচারের দরুন পাল্লা হালকা হবে।

চতুর্থ, পুলসেরাতে বিশ্বাস রাখতে হবে। দোযখের পৃষ্ঠে তরবারির চেয়ে ধারালো এবং চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম একটি পুল নির্মিত রয়েছে, সবাইকে এ পুল অতিক্রম করতে হবে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে কাফেরদের পা এ পুল থেকে ফসকে যাবে এবং তারা দোযখে পতিত হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কৃপায় মুমিনদের পা তাতে অটল থাকবে এবং তারা জান্নাতে পৌঁছে যাবে।

পঞ্চম, হাউজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। ঈমানদারগণ এ হাউজের কাছ দিয়ে যাবে। এটা রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাউজ। জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে এবং পুলসেরাত থেকে নীচে অবতরণের পর মুমিনরা এর পানি পান করবে। যে এর এক চুমুক পানি পান করবে, সে পরে কখনও পিপাসার্ত হবে না। এর প্রস্থ এক মাসের পথ। এর পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্ট। আকাশের তারার সমপরিমাণ পাত্র এর চারপাশে রক্ষিত থাকবে। জান্নাতের হাউজে কাওসার থেকে এসে দুটি নালা এ হাউজে পতিত হয়।

ষষ্ঠ, হিসাব-নিকাশে ঈমান আনতে হবে। হিসাব-নিকাশ বিভিন্ন রূপ হবে। কারও কাছ থেকে চুলচেরা হিসাব নেয়া হবে, কাউকে ক্ষমা করা হবে এবং কেউ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁরা হবেন আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল বান্দা। পয়গম্বরগণের মধ্যে আল্লাহ যাঁকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করবেন রেসালতের বিষয়বস্তু পৌঁছানো হয়েছে কি না। রসূলগণকে মিথ্যা বলার ব্যাপারে কাফেরদের মধ্যেও যাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। বেদআতীদেরকে সুন্নতের ব্যাপারে এবং

মুসলমানদেরকে আমলের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন।

সপ্তম, এরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, তওহীদে বিশ্বাসী গোনাহগাররা শাস্তিভোগের পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। শেষ পর্যন্ত কোন তওহীদ বিশ্বাসী ব্যক্তিই জাহান্নামে থাকবে না। এ থেকে তওহীদ বিশ্বাসীর চিরকাল জাহান্নামে না থাকার কথা জানা গেল।

অষ্টম, শাফায়াতে বিশ্বাস করতে হবে। প্রথমে পয়গম্বরগণ শাফায়াত করবেন, এরপর আলেমগণ, এরপর শহীদগণ,এর পর সকল মুসলমান শাফায়াত করবেন। তাঁদের মধ্যে যাঁর যতটুকু সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তাআলার কাছে হবে, তাঁর শাফায়াত ততটুকু গৃহীত হবে। যে মুমিন এমন থেকে যাবে, তাঁর জন্যে কেউ শাফায়াত করেনি, তাকে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কৃপায় দোযখ থেকে বের করবেন। সুতরাং কোন মুমিন অনন্তকাল দোযখে থাকবে না। যার অন্তরে কণা পরিমাণও ঈমান থাকবে, সেও দোযখ থেকে মুক্তি পাবে।

নবম, এরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, সাহাবায়ে কেরাম শ্রেষ্ঠ এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম এরূপ ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), এরপর হযরত ওমর (রাঃ), এরপর হযরত ওসমান (রাঃ), এরপর হযরত আলী (রাঃ)।

দশম ঃ সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতে হবে এবং তাঁদের প্রশংসা করতে হবে, যেমন আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল (সাঃ) তাঁদের প্রশংসা করেছেন।

উপরোক্ত বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং মনীষীগণের উক্তি এগুলোর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং যেব্যক্তি এসব বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হবে, সে আহলে সুন্নত দলের মধ্যে গণ্য হবে এবং পথভ্রষ্ট ও বেদআতীদের দল থেকে আলাদা থাকবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে পূর্ণ বিশ্বাস দান করুন এবং দ্বীনের উপর কায়েম রাখুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আকায়েদের বিবরণ

প্রকাশ থাকে যে, কলেমায়ে তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ বলা আমাদের জন্যে একটি এবাদত। কিন্তু এ কলেমার যেসব মূলনীতি রয়েছে, সেগুলো না জানা পর্যন্ত কেবল মুখে এর সাক্ষ্য দেয়ার মধ্যে কোন ফায়দা নেই। এসব মূলনীতির উপরই এ কলেমার বাক্য দু'টি ভিত্তিশীল।

জানা দরকার, এ বাক্য দুটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও চারটি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (১) আল্লাহ্ তাআলার সত্তা সপ্রমাণ করা এবং (২) তাঁর গুণাবলী সপ্রমাণ করা, (৩) তাঁর ক্রিয়াকর্ম সপ্রমাণ করা এবং (৪) তাঁর রসূলগণের সত্যতা সপ্রমাণ করা। এ থেকেই জানা গেল, ঈমান চারটি স্তম্ভের উপর এবং প্রত্যেকটি স্তম্ভ দশটি মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল।

প্রথম স্তম্ভের প্রথম মূলনীতি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের প্রমাণ। এ সম্পর্কে কোরআন প্রদর্শিত পন্থাই সর্বোত্তম। কেননা, আল্লাহ তাআলার বর্ণনা অপেক্ষা উত্তম বর্ণনা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন–

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَّالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَّخَلَقْنٰكُمْ
أَزْوَاجًا وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَّجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا . وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا وَّأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً
ثَجَّاجًا لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا وَّجَنّٰتٍ أَلْفَافًا .

অর্থাৎ, আমি কি ভূমিকে বিছানা এবং পর্বতকে গজাল সদৃশ করিনি? আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি, তোমাদেরকে নিদ্রা দিয়েছি বিশ্রামের জন্যে, রাত্রিকে করেছি আবরণস্বরূপ এবং দিবসকে করেছি জীবিকা উপার্জনের সময়। আমি তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে মজবুত

সাত আকাশ নির্মাণ করেছি এবং সমুজ্জ্বল প্রদীপ তৈরী করেছি। আমি পানিবাহী মেঘমালা থেকে প্রচুর বারিপাত করি; তদ্দারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ ও ঘন সন্নিবিষ্ট বাগান।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَايٰتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۔

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের জন্যে লাভজনক বস্তু নিয়ে সমুদ্রে চলমান নৌকায়, আকাশ থেকে আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ পানিতে, যদ্দারা মৃত যমীনকে সঞ্জীবিত করেন ও তাতে ছড়িয়ে দেন সবরকম জীব-জন্তু, আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং আল্লাহর আদেশাধীন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে বিচরণকারী মেঘমালার মধ্যে তাঁদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা বুঝে।"

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে–

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ طِبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَّاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۔

অর্থাৎ, "তোমরা কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ কিভাবে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ এবং তাতে চন্দ্রকে রেখেছেন প্রদীপরূপে। আল্লাহ তোমাদেরকে উৎপন্ন করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করবেন এবং পুনরুত্থিত করবেন।"

আর এক জায়গায় এরশাদ হয়েছে–

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۔

অর্থাৎ, "তোমরা কি তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? তা কি তোমারা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?"

অবশেষে বলা হয়েছে–

نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ۔

অর্থাৎ, "আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু।"

বলাবাহুল্য, যদি সামান্য সচেতন ব্যক্তিও এসব আয়াত সম্পর্কে সামান্য চিন্তাভাবনা করে, আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত বিস্ময়কর বস্তুসমূহের প্রতি এবং জীবজন্তু ও উদ্ভিদের অদ্ভুত প্রজনন প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করে, তবে সে অবশ্যই জানতে পারবে, এই অভূতপূর্ব কারখানা ও অটল ব্যবস্থাপনার একজন রচয়িতা অবশ্যই রয়েছেন। তিনি এগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন। বরং মানুষের মূল সৃষ্টিই এ বিষয়ের সাক্ষ্যদাতা। কারণ, মানুষ আল্লাহর কুদরতের অধীন। তাঁর কৌশল অনুযায়ী ক্রমবিকাশ লাভ করতে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন–

أَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ۔

অর্থাৎ, "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কেই সন্দেহ?"

এ জন্যেই মানুষকে তওহীদের প্রতি আহ্বান করার উদ্দেশে তিনি পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন, যাতে মানুষ বলে উঠে– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। মানুষকে একথা বলার নির্দেশ করা হয়নি যে, তাঁদের এক মাবুদ এবং বিশ্বের অন্য মাবুদ । কেননা, জন্মলগ্ন থেকেই এটা মানুষের মজ্জাগত বিষয় ছিল। তাই আল্লাহ বলেন–

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۔

অর্থাৎ, "তাদেরকে যদি প্রশ্ন কর– আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে, তাঁরা অবশ্যই বলবে– আল্লাহ । আরও বলা হয়েছে–

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ -

অর্থাৎ, "অতএব আপনি একাগ্রতার সাথে প্রতিষ্ঠিত দ্বীনের উপর অনড় থাকুন। এটা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত স্বভাবধর্ম, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিরীতির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক দ্বীন।"

মোট কথা, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের বর্ণনায় মানুষের জন্মের এবং কোরআন পাকের প্রমাণ এত উঁচুর পরিমাণে বিদ্যমান যে, অন্য কোন প্রমাণ উল্লেখ্য করার প্রয়োজন নেই। তবুও আমরা বক্তব্য জোরদার করার উদ্দেশে কালাম শাস্ত্রের অনুসরণে এর একটি যুক্তিও লেখে দিচ্ছি। যে বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে না, তাকে পরিভাষায় 'হাদেস' তথা অনিত্য বলা হয়। এমন অনিত্য বস্তুর অস্তিত্ব লাভের জন্যে কোন কারণ অবশ্যই দরকার। এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। এ বিশ্বও অনিত্য। কেননা, এক সময়ে এটা ছিল না এবং ভবিষ্যতেও এমন সময় আসবে, যখন থাকবে না। সুতরাং এ বিশ্বের অস্তিত্ব লাভের পেছনেও কোন কারণ অবশ্যই রয়েছে। বলাবাহুল্য, এ কারণ হলেন আল্লাহ তাআলা। তিনি সৃষ্টি করেছেন বলেই এ বিশ্বচরাচর অস্তিত্ব লাভ করেছে।

দ্বিতীয় মূলনীতি হল. আল্লাহ তাআলা নিত্য, অনাদি ও চিরন্তন। তাঁর অস্তিত্বের কোন আদি নেই; বরং প্রত্যেক বস্তুর তথা জীবিত ও মৃতের পূর্বে তিনিই আছেন। এর দলীল, আল্লাহ তাআলা 'কাদীম' তথা নিত্য না হয়ে 'হাদেস' তথা অনিত্য হলে তিনিও অস্তিত্ব লাভের জন্যে কোন নিত্য কারণের মুখাপেক্ষী হবেন। সেই কারণটিও অন্য একটি কারণের মুখাপেক্ষী হবে এবং সেটাও অন্য এক কারণের মুখাপেক্ষী হবে। এভাবে এ মুখাপেক্ষিতার কোন অন্ত থাকবে না। ফলে মূল কারণ অর্জিত হবে না। সুতরাং কোন না কোন পর্যায়ে গিয়ে একটি স্বয়ম্ভূ কারণ মানতে হবে, যেটি হবে নিত্য, চিরন্তন ও সর্বপ্রথম। এটাই আমাদের লক্ষ্য এবং এরই

নাম বিশ্বস্রষ্টা, অস্তিত্বদাতা, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক ইত্যাদি।

তৃতীয় মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা অনাদি হওয়ার সাথে সাথে অনন্তও বটে। তাঁর অস্তিত্বের কোন অন্ত নেই; বরং তিনি প্রথম এবং তিনিই শেষ, তিনিই জাহের, তিনিই বাতেন। কারণ, যাঁর চিরন্তনতা সপ্রমাণিত, তাঁর বিলুপ্তি অসম্ভব। কেননা, তিনি বিলুপ্ত হলে হয় আপনা আপনি বিলুপ্ত হবেন, না হয় কোন বিলুপ্তকারীর বিলুপ্ত করার কারণে বিলুপ্ত হবেন। প্রথমটি বাতিল। কেননা, যাকে চিরন্তন কল্পনা করা হয়েছে, তার আপনা আপনি বিলুপ্তি সম্ভব হলে কোন বস্তুর আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভও সম্ভব হবে। বিলুপ্তকারী দ্বারা বিলুপ্ত হওয়াও বাতিল। কেননা, এই বিলুপ্তকারী নিত্য ও চিরন্তন হলে তার উপস্থিতিতে এ সত্তার অস্তিত্ব কিরূপে হল? প্রথমোক্ত দুটি মূলনীতির দ্বারা তাঁর অস্তিত্ব ও চিরন্তনতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে বিলুপ্তকারী হাদেস তথা অনিত্য হলে সে নিজেই চিরন্তনের কারণে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এমতাবস্থায় সে চিরন্তনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে পারে না।

চতুর্থ মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা কোন আয়তনে পরিবেষ্টিত নন; বরং তিনি আয়তনের বেষ্টনী থেকে মুক্ত পবিত্র। এর প্রমাণ, প্রত্যেক বস্তু যে আয়তনে পরিবেষ্টিত রয়েছে, এর মূলে হয় সে বস্তু সে আয়তক্ষেত্রে অবস্থান করছে, না হয় সে ক্ষেত্র থেকে গতিশীল হচ্ছে। অবস্থান ও গতিশীলতা উভয়টি হাদেস তথা অনিত্য। এটা আল্লাহ তাআলার জন্যে নয়।

পঞ্চম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা পদার্থ গঠিত শরীরী নন। কেননা, যা পদার্থ গঠিত, তাকেই শরীরী বলা হয়। আল্লাহ তাআলা পদার্থ হওয়া এবং বিশেষ স্থানে অবস্থানকারী হওয়া যখন বাতিল, তখন তাঁর শরীরী হওয়াও বাতিল। জগত স্রষ্টার শরীরী হওয়া সঠিক হলে সূর্য, চন্দ্র অথবা অন্য কোন শরীরীকে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করাও সম্ভবপর হবে।

ষষ্ঠ মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা কোন শরীরীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কোন গুণ নন। কেননা, সকল শরীরীই নিশ্চিতরূপে হাদেস বা অনিত্য। যে এসব শরীরীকে অস্তিত্ব দান করবে, সে এগুলোর পূর্বে বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা কোন শরীরীর মধ্যে কিরূপে অনুপ্রবেশ করতে পারেন? তিনি তো অনাদিকালে সকলের পূর্বে একাই বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর সাথে অন্য কেউ ছিল না। নিজের পরে

তিনি শরীরী ও গুণসমূহকে সৃষ্টি করেছেন।

এ ছয়টি মূলনীতি থেকে জানা গেল, আল্লাহ তাআলা বিদ্যমান, নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত, তিনি পদার্থ নন, শরীরী নন এবং গুণও নন। সমগ্র বিশ্ব পদার্থ, গুণ ও শরীরী। এতে প্রমাণিত হল, তিনি কারও মত নন এবং কেউ তাঁর মত নয়।

সপ্তম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলার সত্তা দিকের বিশেষত্ব থেকেও পবিত্র। কেননা, দিক ছয়টি– ঊর্ধ্ব, অধঃ, ডান, বাম, অগ্র ও পশ্চাৎ। আল্লাহ তাআলাই এগুলো সব মানব সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। কেননা, তিনি মানুষের দুটি দিক সৃষ্টি করেছেন। একটি ভূমি সংলগ্ন, যাকে পা বলা হয় এবং অপরটি তার বিপরীত, যাকে মাথা বলা হয়। সুতরাং, ঊর্ধ্ব শব্দটি মাথার দিকের জন্য এবং অধঃ শব্দটি পায়ের দিকের জন্যে গঠিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে দুটি হাত সৃষ্টি করেছেন। প্রায়শঃ এর একটি অপরটি অপেক্ষা শক্তিশালী হয়। যে হাতটি অধিক শক্তিশালী, তার নাম রাখা হয়েছে ডান এবং এর বিপরীত হাতের নাম বাম। এর পর যে দিকটি ডান তরফে তার নাম ডান দিক এবং যে দিকটি বাম তরফে তার নাম বাম দিক রাখা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে দুটি তরফ সৃষ্টি করেছেন। এক তরফে দেখে এবং চলে, সেই তরফের নাম হয়েছে অগ্র দিক এবং এর বিপরীত তরফের নাম সাব্যস্ত হয়েছে পশ্চাদ্দিক।

সুতরাং উপরোক্ত ছয়টি দিক মানব সৃষ্টির ফলস্বরূপ সৃজিত হয়েছে। যদি মানুষকে এই আকারে সৃষ্টি করা না হত, বরং বলের মত গোলাকার সৃষ্টি করা হত, তবে এসব দিকেরও অস্তিত্ব থাকত না। সুতরাং এসব দিক হাদেস বা অনিত্য। যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন এসব দিক থাকবে। মানুষের বিলুপ্তির সাথে সাথে এসব দিকেরও বিলুপ্তি ঘটবে। অতএব আল্লাহ তাআলা এগুলোর দ্বারা অনাদিকালেও বিশেষত্ব লাভ করতে পারেন না এবং এখনও পারেন না। কেননা, মানব সৃষ্টির সময় তিনি কোন বিশেষ দিকে ছিলেন না।

আল্লাহ তাআলার জন্যে ঊর্ধ্ব হবে, এ বিষয় থেকে তিনি মুক্ত। কেননা, মাথা থেকে তিনি মুক্ত। মাথার দিককেই বলা হয় ঊর্ধ্ব।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার জন্যে অধঃ হতে পারে না, কেননা, তাঁর পা নেই। এখন প্রশ্ন হয়, দোয়ার সময় হাত আকাশের দিকে উঠানো হয় কেন? জওয়াব, আকাশের দিকেই দোয়ার কেবলা। এতে আরও ইশারা আছে, যার কাছে দোয়া চাওয়া হয়, তিনি প্রতাপশালী ও মহান। উচ্চতার দিক শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব জ্ঞাপন করে। আল্লাহ তাআলা শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রবলতার দিক দিয়ে প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুর ঊর্ধ্বে রয়েছেন।

অষ্টম মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলা সেই অর্থে আরশের উপর সমাসীন, যে অর্থ তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, সমাসীন হওয়ার যে অর্থ তাঁর বিশালতার পরিপন্থী নয় এবং যাতে অনিত্যতা, ফানা বা বিনাশের কোন দখল নেই। নিম্নোক্ত আয়াতে সমাসীন হওয়ার অর্থই বুঝানো হয়েছে–

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاۤءِ وَهِىَ دُخَانٌ ـ

অর্থাৎ, "অতঃপর আল্লাহ্ আকাশে আরোহণ করলেন। তখন আকাশ ছিল ধোঁয়া।"

এ অর্থ কেবল প্রচণ্ডতা ও প্রবলতার দিক দিয়েই সম্ভব। অর্থাৎ, তিনি আকাশের উপর প্রবল হলেন। জনৈক কবি বলেন ঃ "এখন বাশার এরাফের উপর সমাসীন হল। সে তরবারি ও রক্তপাতের মুখাপেক্ষী হয়নি।" সত্যপন্থীদেরকে বাধ্য হয়ে এ ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে। যেমন মিথ্যাপন্থীরা অপারগ হয়ে وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ অর্থাৎ "তোমরা যেখানেই থাক, আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন" আয়াতের ব্যাখ্যা করেছে, সঙ্গে থাকার উদ্দেশ্য বেষ্টন করা ও জানা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن ـ

অর্থাৎ, "মুমিনের অন্তর আল্লাহ্ তাআলার দু'অঙ্গুলির মাঝখানে অবস্থিত।"

এখানে অঙ্গুলির ব্যাখ্যা কুদরত ও প্রবলতা করা হয়েছে। এমনিভাবে الاسود يمين الله فى ارضه অর্থাৎ, হাজারে আসওয়াদ তথা "কৃষ্ণ প্রস্তর পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাআলার দক্ষিণ হস্ত।" এর অর্থ নেয়া

হয়েছে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব। কারণ এগুলোকে বাহ্যিক অর্থে রাখা হলে তা সম্ভব থাকে না। অনুরূপভাবে এক্ষেত্রে استوى শব্দের বাহ্যিক অর্থ অবস্থান করা ও স্থান নেয়া করা হলে আল্লাহ তাআলার শরীরী হওয়া এবং আরশের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহ আরশের সমান হবেন অথবা ছোট হবেন অথবা বৃহৎ হবেন। এসবই অসম্ভব। কাজেই বাহ্যিক অর্থ নেয়াও অম্ভব।

নবম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা আকার, পরিমাণ, দিক ইত্যাদি থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আখেরাতে চর্মচোখে দৃষ্টিগোচর হবেন। কেননা, তিনি বলেন ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ـ

অর্থাৎ, "অনেক মুখমণ্ডল সেদিন প্রফুল্ল হবে– তাদের পালনকর্তাকে অবলোকন করবে।"

তিনি পৃথিবীতে দৃষ্টিগোচর হন না। কারণ, আল্লাহ বলেন–

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ـ

অর্থাৎ, "দৃষ্টি তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না। তিনি দৃষ্টিসমূহকে উপলব্ধি করেন।"

তদুপরি এ কারণে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর জওয়াবে তিনি নিজে বলেন ঃ

لَنْ تَرَانِىْ ـ

অর্থাৎ, "তুমি কিছুতেই আমাকে দেখতে পারবে না।"

এখন কেউ বলুক, আল্লাহ তাআলার যে সিফাত হযরত মূসা (আঃ)-এর পক্ষে জানা সম্ভব হল না, তা মুতাযেলা সম্প্রদায় কেমন করে জেনে নিল এবং দীদার অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও মূসা (আঃ) দীদারের প্রার্থনা কিরূপে করলেন? পরকালে দীদারের আয়াতকে বাহ্যিক অর্থে নেয়ার কারণ, এতে কোন কিছু অসম্ভব হওয়া জরুরী হয় না। কেননা, দর্শনও এক প্রকার জ্ঞান ও কাশ্‌ফ। তবে তা জ্ঞান অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট। সুতরাং আল্লাহ তাআলা কোন দিকে না থাকা সত্ত্বেও যখন তাঁর সাথে জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে, তখন এমনি অবস্থায় দেখাও তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। আল্লাহকে জানা যেমন আকার ছাড়াই সম্ভব,

তেমনি তাঁকে দেখাও আকার আকৃতি ব্যতিরেকেই সম্ভবপর।

দশম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলার কোন শরীক নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয়। তিনি একাই আবিষ্কার করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কোন সমতুল্য, সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, যে তাঁর সাথে কলহ ও বিরোধ করতে পারে। এর প্রমাণ এই আয়াত–

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ـ

অর্থাৎ, যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ ব্যতীত আরও উপাস্য থাকত, তবে আকাশ ও পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত।

এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, যদি আল্লাহ দু'জন থাকে এবং তাঁদের মধ্যে কোন একজন কোন কাজ করতে চায়, তবে অন্যজন তার সাথে সায় দিতে বাধ্য হলে সে অক্ষম অপারগ বলে বিবেচিত হবে। সর্বশক্তিমান হবে না। আর যদি দ্বিতীয় জন প্রথম জনকে প্রতিহত করতে ও বিরোধিতা করতে সক্ষম হয়, তবে দ্বিতীয় জন শক্তিশালী ও প্রবল হবে আর প্রথম জন দুর্বল ও অক্ষম প্রতিপন্ন হবে; সর্বশক্তিমান হবে না।

দ্বিতীয় স্তম্ভ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার গুণাবলী সপ্রমাণ করার প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান এবং এ উক্তিতে সত্যবাদী–

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ, "তিনি সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।"

এর কারণ, এ বিশ্ব কারিগরি দিক দিয়ে অত্যন্ত মজবুত এবং সৃষ্টিগতভাবে সুনিপুণ ব্যবস্থাপনার অধীন। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি চমৎকার বয়নযুক্ত, কারুকার্যখচিত ও সুসজ্জিত রেশমী বস্ত্র দেখে ধারণা করে, এটা কোন মৃত ব্যক্তি বয়ন করে থাকবে, যে কিছু করতে পারে না, তাহলে সে কি নির্বোধ মূর্খ বলে গণ্য হবে না? তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা নির্মিত বিশ্বকে দেখেও তাঁর কুদরত অস্বীকার করা নিছক বোকামি বৈ নয়।

দ্বিতীয় মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা স্বীয় জ্ঞান দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন অনুকণা নেই, যা তাঁর জ্ঞানে অনুপস্থিত। তিনি এ উক্তিতে সত্যবাদী–

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۔

অর্থাৎ, তিনি সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। তিনি আরও বলেন–

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۔

অর্থাৎ, "যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না, অথচ তিনি রহস্যজ্ঞানী সর্বজ্ঞ?" এতে নির্দেশ করেছেন, সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর জ্ঞান উপলব্ধি করে নাও। কেননা, সামান্য বস্তুর মধ্যেও নিপুণ সৃষ্টি ও সাজানো গোছানো শিল্পকর্ম দেখে নিঃসন্দেহে শিল্পীর ব্যবস্থাপনা জ্ঞান উপলব্ধি করা যায়।

তৃতীয় মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলা জীবিত। কেননা, যার জ্ঞান ও কুদরত প্রমাণিত, তার জীবনও অবশ্যই প্রমাণিত হবে। যার কুদরত চলমান এবং যার জ্ঞান ও কৌশল অব্যাহত, তাকে যদি জীবিত নয় বলে কল্পনা করা যায়, তবে গতিশীল ও স্থিতিশীল থাকা অবস্থায় জীবজন্তুর জীবন সম্পর্কেও সন্দেহ হতে পারে; বরং কারিগর, শিল্পী, শহরে ও বনে ঘুরাফেরাকারী এবং দেশ বিদেশের যত মুসাফির রয়েছে তাদের সকলের জীবন সম্পর্কেই সন্দেহ হতে পারে। এটা পথভ্রষ্টতা বৈ কিছু নয়।

চতুর্থ মূলনীতি, আল্লাহ তআলা স্বীয় কর্মের ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ, যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে তা তাঁর ইচ্ছায় অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। কারণ, যে কাজ তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশ পায়, তার বিপরীত কাজটিও প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কুদরত উভয় কাজের সাথে একই রূপ সম্পর্ক রাখে। সুতরাং উভয় কাজের মধ্য থেকে এক কাজের দিকে কুদরতকে ফিরিয়ে আনার জন্যে একটি ইচ্ছা থাকা একান্ত দরকার।

পঞ্চম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। অন্তরের কুমন্ত্রণা, চিন্তাভাবনা ও ধারণার মত গোপন বিষয়ও তাঁর দৃষ্টিতে অনুপস্থিত নয় এবং অন্ধকার রাতে শক্ত পাথরের উপর কাল পিঁপড়ার শব্দও তাঁর শ্রবণের বাইরে নয়। কেননা, শ্রবণ ও দর্শন পূর্ণতার গুণ, অপূর্ণতার গুণ নয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলার জন্যে শ্রবণ ও দর্শন স্বীকার না করলে তাঁর সৃষ্টি হয়ে যাবে পূর্ণ এবং তিনি অপূর্ণ হয়ে যাবেন। এছাড়া

পিতার সামনে পেশকৃত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রমাণও বৈধ হবে না। তাঁর পিতা অজ্ঞতাবশতঃ প্রতিমা পূজা করত। তিনি পিতাকে বললেন

لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا ۔

অর্থাৎ, "আপনি এমন প্রতিমার পূজা কেন করেন, যে শুনে না, দেখে না এবং আপনার কোন উপকার করে না।"

সুতরাং তুমিও যদি পিতার উপাস্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, তবে তোমার প্রমাণাদি বাতিল হয়ে যাবে এবং আল্লাহর উক্তির সত্যতাও প্রতিষ্ঠিত হবে না– تِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ

অর্থাৎ, "এটা আমার প্রমাণ, যা আমি ইব্রাহীমকে তার কওমের মোকাবিলায় দান করেছি।"

যেমন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়াই আল্লাহ তাআলার কর্তা হওয়া এবং অন্তর ও মস্তিষ্ক ছাড়া জ্ঞানী হওয়া প্রতীয়মান হয়েছে, তেমনি চক্ষুকোটর ছাড়া তাঁর দর্শক হওয়া এবং কর্ণকুহর ছাড়া শ্রোতা হওয়াও বুঝে নেয়া উচিত। এতদুভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

ষষ্ঠ মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলা কথা বলেন এবং তাঁর কালাম (কথা) তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত একটি সিফত। এ কালাম কণ্ঠস্বরও নয় এবং অক্ষরও নয়। তাঁর কালাম অন্যের কালামের অনুরূপ নয়, যেমন তাঁর সত্তা অন্যের সত্তার মত নয়। আসলে মনের কালামই সত্যিকার কালাম। অক্ষর ও কণ্ঠস্বর তো কেবল ব্যক্ত করার জন্য। যেমন, নড়াচড়া ও ইশারা দ্বারাও মাঝে মাঝে ব্যক্ত করা যায়। জানি না, কোন কোন লোকের কাছে এ বিষয়টি কেন দুর্বোধ্য হয়ে গেল। অথচ জাহেলিয়াত যুগের কবিদের কাছেও এটা দুর্বোধ্য ছিল না। তাই জনৈক কবি বলেন ঃ কালামের অস্তিত্ব কেবল অন্তরের মধ্যে। জিহ্বা এর প্রমাণ মাত্র। তবে কতক লোককে এসব বিষয় থেকে দূরে রাখার মধ্যে আল্লাহ তাআলার কোন প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে। তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়াত করতে পারে না। হযরত মূসা (আঃ) দুনিয়াতে কণ্ঠস্বর ও অক্ষরবিহীন কালাম শ্রবণ করেছেন– যেব্যক্তি একথা অসম্ভব মনে করে, তবে তার উচিত আখেরাতে

দেহ ও রংবিহীন বস্তু দেখার সম্ভাবনা অস্বীকার করা। কিন্তু এটা সে স্বীকার করে থাকে, যদিও এ পর্যন্ত এমন কোন বস্তু দেখেনি। সুতরাং দেখার ব্যাপারেও তাই স্বীকার করা উচিত, যা শ্রবণের ব্যাপারে বুঝে আসে।

সপ্তম মূলনীতি, আল্লাহর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত কালাম চিরন্তন। তার সকল সিফতও তেমনি। কেননা, অনিত্য বস্তুসমূহের পাত্র হওয়া আল্লাহ তাআলার শানের পরিপন্থী। কারণ, অনিত্য বস্তুসমূহ পরিবর্তিত হতে থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলার মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই।

অষ্টম মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলার এলেম চিরন্তন। অর্থাৎ, তিনি সর্বদা আপন সত্তা, সিফত এবং যা কিছু সৃষ্টি করেন, সকলকে অনাদিকাল থেকে জানেন। যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করেন তখন তার এলেম নতুন অর্জিত হয় না; বরং অনাদি-অনন্তকালব্যাপী তা তাঁর রয়েছে।

নবম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা চিরন্তন। বিশেষ ও উপযুক্ত সময়ে সৃষ্টি কর্মের সাথে পূর্ব জ্ঞান অনুযায়ী অনাদিকালেই এ ইচ্ছার সম্পর্ক হয়ে আছে। কেননা, তাঁর ইচ্ছা অনিত্য হলে তিনি অনিত্য বস্তুসমূহের পাত্র সাব্যস্ত হবেন, যা তাঁর শানের পরিপন্থী।

দশম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা এলেম সহকারে আলেম, জীবন সহকারে জীবিত, শক্তি সামর্থ্য সহকারে শক্তিমান, ইচ্ছা সহকারে ইচ্ছাকারী, কালাম সহকারে মুতাকাল্লিম (বক্তা), শ্রবণ সহকারে শ্রোতা এবং দর্শক সহকারে দ্রষ্টা। এগুলো তাঁর চিরন্তন সিফত। অতএব যারা তাঁকে এলেম ব্যতিরেকে আলেম বলে, তারা যেন কাউকে ধন ব্যতিরেকে ধনী বলে, যা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

তৃতীয় স্তম্ভ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার ক্রিয়াকর্ম সপ্রমাণ করার প্রথম মূলনীতি, বিশ্বে যা কিছু অনিত্য ও সৃষ্ট, তা আল্লাহ তাআলারই কর্ম ও আবিষ্কার। তিনি ব্যতীত কোন স্রষ্টা বিশ্ব সৃষ্টি করেনি। সুতরাং বান্দার সমস্ত ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ তাআলার কুদরতের সাথে জড়িত।

নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এ মূলনীতির সমর্থন পাওয়া যায়–

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ۔

"অর্থাৎ, সবকিছুর স্রষ্টাই আল্লাহ।"

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ۔

অর্থাৎ, "আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং যা তোমরা কর, তাকে।"

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۔

অর্থাৎ, "তোমরা গোপনে কথা বল অথবা প্রকাশ্যে, তিনি অন্তরের রহস্য জানেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি জানবেনই না বা কেন? তিনি রহস্যজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত।"

দ্বিতীয় মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা বান্দার কাজকর্মের স্রষ্টা– এটা এ বিষয়কে জরুরী করে না, কাজকর্ম 'ইকতিসাব' তথা উপার্জন হিসাবে বান্দার ক্ষমতাধীন থাকবে না। বরং আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা ও ক্ষমতাশালী উভয়কেই সৃষ্টি করেছেন। কুদরত তথা ক্ষমতা বান্দার একটি আল্লাহ প্রদত্ত গুণ, যা বান্দার উপার্জিত নয়। অর্থাৎ বান্দার ক্রিয়াকর্ম একটা কুদরতী গুণের অধীনে সৃজিত হয়েছে। সুতরাং ক্রিয়াকর্ম সৃষ্টির দিক দিয়ে আল্লাহ তাআলার কুদরতের অধীন এবং ইকতিসাব ও উপার্জনের দিক দিয়ে বান্দার ক্ষমতার অধীন। কাজেই বান্দার ক্রিয়াকর্ম নিছক বাধ্যতামূলক নয়।

তৃতীয় মূলনীতি, বান্দার কর্ম বান্দার উপার্জন হলেও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বাইরে নয়। এ থেকে বুঝা গেল, পৃথিবীতে ভাল-মন্দ, সৎ অসৎ, লাভ-লোকসান, কুফর-ঈমান, গোমরাহী-হেদায়াত, আনুগত্য-নাফরমানী ইত্যাদি যা কিছু হয়, সব আল্লাহ তাআলারই ফয়সালা দ্বারা হয় এবং তাঁর ইচ্ছা ও বাসনায় প্রকাশ পায়। কেউ তাঁর ফয়সালা টলাতে পারে না এবং তাঁর আদেশ পেছনে হটাতে পারে না। তিনি যাকে ইচ্ছা গোমরাহ এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করেন। তিনি যা করেন তার জন্য কারও কাছে জওয়াবদিহি করেন না, তবে বান্দাকে জওয়াবদিহি করতে হবে। এর ইতিহাসগত প্রমাণ হচ্ছে, সমগ্র উম্মত এ বাক্যের সত্যতায় বিশ্বাস করে। ماشاء الله كان وما لم يشا لم يكن

অর্থাৎ, আল্লাহ্ যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয় না।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

اَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করতেন।"

لَوْشِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ

অর্থাৎ "আমি ইচ্ছা করলে সকলকে সৎপথ দান করতাম।"

এর যৌক্তিক প্রমাণ হল, যদি আল্লাহ তাআলা গোনাহ ও অন্যায়কে খারাপ মনে করে এগুলোর ইচ্ছা না করেন, তবে এগুলো তাঁর দুশমন অভিশপ্ত ইবলীসের ইচ্ছায় হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, মানুষের মধ্যে গোনাহ্ নাফরমানীই অধিক। তা হলে দেখা যায়, ইবলীস আল্লাহ্ তাআলার শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তার ইচ্ছানুযায়ী মানুষ অধিক কাজ সম্পাদন করে এবং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুযায়ী কম কাজ সম্পাদন করা হয়। এখন বল, মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার মর্যাদা এমন স্তরে কিরূপে নামিয়ে দেবে, যে স্তরে গ্রামের কোন মাতাব্বরকে নামিয়ে দিলে সে-ও মাতাব্বরীকে ঘৃণা করতে শুরু করবে? অর্থাৎ, গ্রামে যদি মাতাব্বরের কোন শত্রু থাকে এবং তার ইচ্ছানুযায়ী অধিক কাজ সম্পাদিত হয় মাতাব্বরের ইচ্ছা কমই পালিত হয়, তবে মাতাব্বর ব্যক্তি এমন মাতাব্বরীকে কি অবমাননাকর মনে করবে না? বেদআতীদের মতে মানুষের নাফরমানী, যা সংখ্যায় অধিক– আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার খেলাফে হয়ে থাকে। এটা আল্লাহ্ তাআলা দুর্বল ও অক্ষম হওয়ার দলীল (নাউযু বিল্লাহ্)। সুতরাং যখন প্রমাণিত হল, বান্দার ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট, তখন এটাও প্রামাণিত হল যে, বান্দার ক্রিয়াকর্ম তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সম্পাদিত হয়। এখন প্রশ্ন হয়, আল্লাহ তাআলা যে কাজের ইচ্ছা করেন তা করতে বান্দাকে নিষেধ করেন কিরূপে এবং যে কাজের ইচ্ছা তিনি করেন না, সে কাজের আদশ করেন কিরূপে? এর জওয়াব হচ্ছে, আদেশ ও ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। আদেশ করলেই ইচ্ছা করা জরুরী হয় না।

চতুর্থ মূলনীতি, সৃষ্টি, আবিষ্কার, আদেশ– এগুলো আল্লাহ্ তাআলার

অনুগ্রহ, তাঁর উপর ওয়াজেব নয়। মু'তাযেলা সম্প্রদায় বলে, এগুলো তাঁর উপর ওয়াজেব। কারণ, এর মধ্যে বান্দার কল্যাণ নিহিত। তাদের এ উক্তি ঠিক নয়। কেননা ওয়াজেবকারী তো তিনিই। অতএব তিনি নিজে কিরূপে ওয়াজেব হওয়ার লক্ষ্যস্থল হতে পারেন? ওয়াজেব এমন কাজকে বলা হয়, যা বর্জন করলে ভবিষ্যতে অথবা তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতি হয়। উদাহরণতঃ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ওয়াজেব। এর অর্থ, এই আনুগত্য বর্জন করলে ভবিষ্যতে অর্থাৎ, আখেরাতে শাস্তিভোগ করতে হবে। অথবা পিপাসিত ব্যক্তির উপর পানি পান করা ওয়াজেব। অর্থাৎ, এটা বর্জন করলে পরিণামে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই অর্থে আল্লাহ্ তাআলার উপর কোন কিছু ওয়াজেব হতেই পারে না।

পঞ্চম মূলনীতি, যে কাজ করার শক্তি বান্দার মধ্যে নেই, সেই কাজের আদেশ করা আল্লাহ্ তাআলার জন্যে বৈধ, যদিও তিনি এরূপ আদেশ করেন না। কেননা, বৈধ না হলে এটা না করার প্রার্থনা অর্থহীন হবে। অথচ আল্লাহ তাআলার উক্তিতে এরূপ প্রার্থনা প্রমাণিত রয়েছে–

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ـ

অর্থাৎ, "হে পরওয়ারদেগার! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব আরোপ করো না, যার শক্তি আমাদের নেই।"

ষষ্ঠ মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা কোন পূর্ব অপরাধ অথবা ভবিষ্যৎ সওয়াব ব্যতিরেকেই তাঁর সৃষ্টিকে কষ্ট ও শাস্তি দিতে পারেন। এটা তাঁর জন্যে বৈধ। কেননা, তিনি আপন মালিকানায় এ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন– অন্যের মালিকানায় নয়। অপরের মালিকানায় তার অনুমতি ছাড়া ক্ষমতা প্রয়োগ করাকে জুলুম বলা হয়। এটা আল্লাহ্র জন্যে অসম্ভব। কেননা, তাঁর সামনে অন্যের কোন মালিকানা নেই যে, তাতে ক্ষমতা প্রয়োগ করলে জুলুম হবে। এ বিষয়ের অস্তিত্বই এর বৈধ হওয়ার দলীল। আমরা জন্তু জানোয়ারকে যবেহ্ হতে দেখি। মানুষ তাদেরকে নানা রকম কষ্ট দিয়ে থাকে। অথচ পূর্বে তাদের তরফ থেকে কোন অপরাধ প্রকাশ পায় না। সুতরাং কেউ যদি বলে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতে জন্তু-জানোয়ারকে জীবিত করবেন এবং তাদেরকে মানুষের কাছ থেকে নির্যাতনের বদলা দান করবেন, তবে তা শরীয়ত ও বিবেক উভয়ের গণ্ডির বাইরে।

সপ্তম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা বান্দার সাথে যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করেন। বান্দার জন্যে যা অধিক উপযুক্ত, তা করা তাঁর উপর ওয়াজেব নয়। কেননা, আমরা পূর্বেই লেখেছি যে, আল্লাহ তাআলার উপর কোন কিছু ওয়াজেব হওয়া বোধগম্য নয়। তিনি যা করেন তার জন্যে তাকে জওয়াবদিহি করতে হয় না। কিন্তু মানুষের কাজের জওয়াবদিহি রয়েছে।

অষ্টম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলার মারেফত ও এবাদত তাঁর ওয়াজেব করার দিক দিয়ে এবং শরীয়তের আইনের দিক দিয়ে ওয়াজেব।

নবম মূলনীতি, পয়গম্বর প্রেরণ নিষ্ফল নয়। ব্রাম্মণ্যবাদী সম্প্রদায় এর বিপরীতে বলে, বিবেকের উপস্থিতিতে পয়গম্বর প্রেরণের মধ্যে কোন উপকারিতা নেই। এর জওয়াব হচ্ছে, আখেরাতে মুক্তির কারণ হয় এমন কাজ বিবেক দ্বারা জানা যায় না, যেমন বিবেক দ্বারা স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী ওষুধপত্র জানা যায় না। সুতরাং চিকিৎসকের যেমন প্রয়োজন তেমনি পয়গম্বরগণেরও প্রয়োজন। পার্থক্য হচ্ছে, চিকিৎসকের কথা অভিজ্ঞতা দ্বারা সত্য প্রমাণিত হয়, আর পয়গম্বর মোজেযা দ্বারা সত্য প্রমাণিত হন।

দশম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে খাতামুন্নাবিয়্যীন (সর্বশেষ নবী)-রূপে এবং পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের জন্যে রহিতকারীরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁকে প্রকাশ্য মোজেযা দ্বারা সমর্থন দান করেছেন; যেমন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, কংকরের তসবীহ্ পাঠ করা, চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা, অঙ্গুলি থেকে পানির ঝরণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি। মুহাম্মদ (সাঃ) যে প্রকাশ্য মোজেযা দ্বারা সমগ্র আরবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন, তা হচ্ছে কোরআন মজীদ। ভাষাশৈলী ও অলঙ্কার নিয়ে আরববাসীদের গর্বের অন্ত ছিল না। এতদসত্ত্বেও তারা কোরআনের মোকাবিলা করতে সক্ষম হল না। কেননা, কোরআনে যে চমৎকার রচনাশৈলী, ভাবের গাম্ভীর্য ও বাক্যাবলীর বিশুদ্ধতা রয়েছে, তার সমাবেশ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। আরবরা তাঁকে গ্রেফতার করেছে, লুটেছে, হত্যার চেষ্টা করেছে এবং দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে; কিন্তু পারেনি কেবল কোরআনের মত রচনা পেশ করতে। অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিরক্ষর ছিলেন, পড়ালেখার ধারে-কাছেও যাননি। এতদসত্ত্বেও

তিনি কোরআন পাকে পূর্ববর্তী লোকদের নির্ভুল খবর এবং অনেক বিষয়ে অদৃশ্যের সংবাদাদি বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর সত্যতা পরবর্তীকালে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় এর দৃষ্টান্ত ঃ

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ -

অর্থাৎ, "আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে এবং কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে।"

الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ -

অর্থাৎ, রোম পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী ভূভাগে, কিন্তু তারা এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয়ী হবে।

মোজেযা রসূলের সত্যতার প্রমাণ। কেননা, যে কাজ করতে মানুষ অক্ষম তা আল্লাহর কাজ ছাড়া অন্য কারও কাজ হবে না। এ ধরনের কাজ নবীর সাথে জড়িত হয়ে প্রকাশ পেলে এর অর্থ হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর সত্যতা ঘোষণা করা।

চতুর্থ স্তম্ভ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রসূলগণের সত্যায়ন প্রমাণ করার প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, হাশর ও নশর হবে। শরীয়তে এর খবর বর্ণিত হয়েছে। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব। বিবেকের বিচারে এর অস্তিত্ব সম্ভবপর। এর অর্থ হচ্ছে, মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হওয়া। আল্লাহ তাআলা যে কুদরতের বলে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, সেই কুদরতের বলেই পুনরায় জীবিত করবেন। তিনি নিজেই বলেন ঃ

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ -

অর্থাৎ "কাফের বলল, অস্থিসমূহ পচে যাওয়ার পর ওগুলো কে জীবিত করবে? বলে দিন ঃ যিনি এগুলো প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনিই জীবিত করবেন।"

এতে প্রথমবার সৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবনের প্রমাণরূপে পেশ করা হয়েছে। অন্যত্র বলেন ঃ

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۔

অর্থাৎ, "তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একই সত্তার সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মতই।"

বলাবাহুল্য, পুনরায় সৃষ্টি দ্বিতীয় সূচনা। সুতরাং এটা প্রথম সূচনার মতই সম্ভবপর।

দ্বিতীয় মূলনীতি, মুনকার নকীরের প্রশ্নকে সত্যায়ন করা ওয়াজেব। এটি বিবেকের দৃষ্টিতেও সম্ভবপর। কেননা, এতে জরুরী হয় যে, জীবন পুনরায় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, যেখানে সম্বোধন করা সম্ভবপর। এতে আপত্তি করা যায় না যে, মৃত ব্যক্তির অঙ্গসমূহ স্থির থাকে এবং মুনকার নকীরের প্রশ্ন শুনতে পায় না। কেননা, নিদ্রিত ব্যক্তিও বাহ্যতঃ স্থির থাকে, কিন্তু অভ্যন্তরে এমন কষ্ট ও স্বাদ অনুভব করে, যার প্রভাব জাগ্রত হওয়ার পরও অব্যাহত থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জিব্রাঈলের কথাবার্তা শুনতেন এবং তাঁকে দেখতেন। কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে থাকত তারা শুনত না এবং দেখত না। এমনকি কিছু জানতেও পারত না।

তৃতীয় মূলনীতি, কবরের আযাব শরীয়তে প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন–

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَّيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۔

অর্থাৎ, "তাদেরকে অগ্নিতে পেশ করা হয় সকাল-সন্ধ্যায়। যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে (বলা হবে), ফেরাউনের বংশধরকে কঠোরতম শাস্তিতে দাখিল কর।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সকল পূর্ববর্তী মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

কবরের আযাব সম্ভবপর। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব। মৃত ব্যক্তির খণ্ড-বিখণ্ড অংশ হিংস্র জন্তুদের পেটে এবং পক্ষীদের চঞ্চুতে বিভক্ত হয়ে যাওয়া কবরের আযাব সত্য হওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা, আযাবের ব্যথা প্রাণীর বিশেষ অংশে অনুভূত হয়। প্রাণীর এসব বিক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে অনুভব শক্তি সৃষ্টি করে দেয়া আল্লাহ তাআলার কুদরতের অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ মূলনীতি মীযান তথা দাঁড়িপাল্লা। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۔

অর্থাৎ, "আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব।"

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۔

অর্থাৎ, "অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। আর যার পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। তারা চিরকাল দোযখে থাকবে।'

আল্লাহ তাআলার কাছে আমলের মর্যাদা যত বেশী হবে, আমলনামার ওজন তত বেশী হবে। এতে বান্দা তার আমলের পরিমাণ জেনে যাবে এবং সে স্পষ্ট বুঝবে, আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিলে তা ন্যায়বিচার হবে এবং সওয়াব দিলে তা হবে অনুগ্রহ।

পঞ্চম মূলনীতি পুলসেরাত, যা জাহান্নামের উপর নির্মিত এবং চুলের চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম ও তরবারির চেয়ে অধিক ধারালো।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ ۔

অর্থাৎ, অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত কর এবং তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দাও। নিশ্চয় তারা জিজ্ঞাসিত হবে।" এ পুল সম্ভবপর। তাই একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব। যে আল্লাহ পাখীকে শূন্যে উড়াতে সক্ষম, তিনি মানুষকে এ পুলের উপর দিয়ে চালাতেও সক্ষম হবেন।

ষষ্ঠ মূলনীতি, জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ তাআলার সৃজিত। আল্লাহ

তাআলা বলেন ঃ

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ -

অর্থাৎ "তোমরা ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার মাগফেরাতের দিকে এবং জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীব্যাপী। এটা খোদাভীরুদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।"

"প্রস্তুত করা হয়েছে" শব্দ থেকে জানা যায়, জান্নাত সৃজিত। তাই একে আক্ষরিক অর্থে থাকতে দেয়া ওয়াজেব। যদি কেউ বলে, বিচার দিবসের পূর্বে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই, তবে এর জওয়াব, আল্লাহ তাআলা যা কিছু করেন তজ্জন্য তার কোন জওয়াবদিহি নেই। বান্দার কৃতকর্মের জওয়াবদিহি আছে।

সপ্তম মূলনীতি, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে সত্যপন্থী ইমাম (শাসক) হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), তাঁর পরে হযরত ওমর (রাঃ), তাঁর পরে হযরত ওসমান (রাঃ) এবং তাঁর পরে হযরত আলী (রাঃ)। তাঁর পরে ইমাম কে হবেন, সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অকাট্য কোন কথা বলেননি। যদি বলতেন, তবে তা অবশ্যই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেত; যেমন বিভিন্ন শহরে তিনি যাঁদেরকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের বিষয় অজানা থাকেনি। এর তুলনায় ইমামের বিষয়টি আরও অধিক প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিল। এটা কিরূপে গোপন রইল? আর যদি প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা হলে তা মিটে গেল কিরূপে? আমাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছল না কেন? সারকথা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) জনগণের পছন্দের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বয়াতের তরীকায় খলীফা হয়েছেন। যদি বলা হয়, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এরশাদ অন্যের জন্যে ছিল, তবে সকল সাহাবায়ে কেরামকে দোষী সাব্যস্ত করতে হয় যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। একমাত্র রাফেযী সম্প্রদায় ছাড়া কেউ এ ব্যাপারে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেনি। আহলে সুন্নতের আকীদা হচ্ছে, সকল সাহাবীকে ভাল বলতে হবে। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল যেমন তাঁদের প্রশংসা করেছেন, তেমনি প্রশংসা করতে হবে। হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মধ্যে যে মতপার্থক্য হয়েছে, তা সবই ছিল

ইজতিহাদ ভিত্তিক, হযরত মোয়াবিয়ার ক্ষমতালিপ্সার কারণে নয়। হযরত আলী (রাঃ) ধারণা করেছিলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ঘাতকদেরকে আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর হাতে সোপর্দ করার পরিণতিতে গোলযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে। কারণ, তাদের গোত্রের লোক সংখ্যা অনেক বেশী এবং সেনাবাহিনীতে মিশে রয়েছে। তাই অপরাধীদেরকে সোপর্দ করার বিষয়টি তিনি বিলম্বিত করা উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন। অপর দিকে হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) মনে করেছেন, এত বড় অন্যায় সত্ত্বেও অপরাধীদের শাস্তির ব্যাপারটি বিলম্বিত করার অর্থ তাদেরকে প্রশ্রয় দেয়া এবং এই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করা। বড় বড় আলেমগণ বলেন, প্রত্যেক মুজতাহিদই সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকেন, তবে সত্যে উপনীত হন একজনই। হযরত আলী (রাঃ) ভুলের উপর ছিলেন– একথা কোন আলেম বলেন না।

অষ্টম মূলনীতি, সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব খেলাফতের ক্রমানুযায়ী। কেননা, আল্লাহ তাআলার কাছে যা শ্রেষ্ঠত্ব, সেটাই বাস্তব শ্রেষ্ঠত্ব। আল্লাহ তাআলার কাছে শ্রেষ্ঠত্ব কোন্‌টি এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়। সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় অনেক আয়াত ও হাদীস বর্ণিত আছে। শ্রেষ্ঠত্বের সূক্ষ্ম বিষয়াদি এবং ক্রম তাঁরাই জানেন। যাঁরা কোরআনের অবতরণ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের এ ধারাবাহিকতা না বুঝে থাকলে খেলাফতকে এভাবে সাজাতেন না। কেননা, তাঁরা আল্লাহ তাআলার কাজে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করতেন না এবং কোন বাধাই তাঁদেরকে সত্য পথ থেকে বিরত রাখতে পারত না।

নবম মূলনীতি, মুসলমান, বালেগ, বুদ্ধিমান ও স্বাধীন খলীফা হওয়ার জন্যে পাঁচটি শর্ত ঃ পুরুষ হওয়া, পরহেযগার হওয়া, আলেম হওয়া, স্বাবলম্বী হওয়া ও কোরায়শী হওয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ الائمة من قريش। অর্থাৎ, খলীফা কোরায়শদের মধ্য থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই পঞ্চগুণসম্পন্ন অনেক লোক বিদ্যমান থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তি খলীফা হবেন। যেব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের বিরোধিতা করে, সে বিদ্রোহী।

দশম মূলনীতি, খোদাভীরু এবং আলেম না হয়েও যেব্যক্তি

খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকে, তাকে পদচ্যুত করলে যদি জনগণের জন্যে অসহনীয় ফেতনা দেখা দেয়, তবে আমরা বলব, তার খেলাফত বৈধ। কেননা, তাকে পদচ্যুত করার পর অন্য কেউ খলীফা হবে কিংবা খেলাফতের পদ শূন্য থাকবে। অন্য কেউ খলীফা হলে ফেতনা সৃষ্টি হওয়ার কারণে মুসলমানদের যে ক্ষতি হবে তা বর্তমান খলীফার মধ্যে কিছু শর্তের অনুপস্থিতির ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী হবে। বলাবাহুল্য, অধিক উপযোগিতা লাভের খাতিরেই এসব শর্ত। এখন অধিক উপযোগিতা অর্জিত না হওয়ার ভয়ে মূল উপযোগিতা হাতছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পক্ষান্তরে খেলাফতের পদ শূন্য থাকলে শাসনকার্য অচল হয়ে পড়বে। তাই পূর্বাবস্থা বহাল থাকাই সঙ্গত।

মোট কথা, উপরোক্ত চারটি স্তম্ভে বর্ণিত চল্লিশটি মূলনীতিই হচ্ছে আকায়েদ। কেউ এগুলো বিশ্বাস করলে সে আহলে সুন্নতের অনুসারী এবং বেদআতী সম্প্রদায় থেকে আলাদা থাকবে। আমরা দোয়া করি– আল্লাহ স্বীয় তওফীক দ্বারা আমাদেরকে সত্যের উপর কায়েম রাখুন এবং স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করুন।

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم -

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য

ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে তিন প্রকার মত দেখা যায় ঃ (১) কেউ বলেন, উভয়টি এক ও অভিন্ন, (২) কেউ বলেন উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন, পরস্পর মিলে না এবং (২) কেউ বলেন, বিষয় দুটিই, কিন্তু একটি অপরটির সাথে জড়িত। এখন আমরা তিন প্রকার আলোচনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে যা প্রকাশ্য সত্য, তা বর্ণনা করছি।

প্রথম প্রকার আলোচনা উভয়ের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে। সত্য হচ্ছে, ঈমানের অর্থ সত্যায়ন করা অর্থাৎ, সত্য বলে প্রকাশ করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا "তুমি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না।" মুমিন অর্থ সত্যায়নকারী। ইসলামের অর্থ আনুগত্য স্বীকার করা এবং বাধ্যতা, অস্বীকৃতি ও হটকারিতা বর্জন করা। সত্যায়ন এক বিশেষ স্থান অর্থাৎ, অন্তর দ্বারা হয়। মুখ তার ভাষ্যকার। স্বীকার করা অন্তর, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবগুলো দ্বারা হয়। কেননা, যে সত্যায়ন অন্তর দ্বারা হয়, তাই মেনে নেয়া ও অস্বীকার বর্জন করা, অনুরূপভাবে মুখে স্বীকার করা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আনুগত্য পালন করা। সারকথা, অভিধানের দিক দিয়ে ইসলাম একটি ব্যাপক বিষয় এবং ঈমান বিশেষ বিষয়। ইসলামের শ্রেষ্ঠ অঙ্গের নাম ঈমান। এ থেকে জানা গেল, প্রত্যেক সত্যায়নই মেনে নেয়া, কিন্তু প্রত্যেক মেনে নেয়া সত্যায়ন নয়।

দ্বিতীয় প্রকার আলোচনা শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান ও ইসলামের অর্থ সম্পর্কে। সত্য এই যে, শরীয়তে উভয়ের ব্যবহার তিনভাবে হয়েছে– উভয়কে এক অর্থে ধরে, উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন ধরে এবং একটির অর্থে অপরটিকে অন্তর্ভুক্ত ধরে।

প্রথমোক্ত ব্যবহার– যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থাৎ, অতঃপর সেখানে যারা ঈমানওয়ালা ছিল, আমি তাদেরকে

উদ্ধার করলাম, কিন্তু সেখানে মাত্র একজন মুসলমানের গৃহ পাওয়া গেল।

এ ঘটনায় সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, গৃহ একটিই ছিল এবং এরই জন্যে মুমিনীন ও মুসলিমীন শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে।

يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ -

অর্থাৎ "হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাক তবে তাঁর উপরই ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলমান হও।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। একবার তাঁকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জওয়াবে এ পাঁচটি স্তম্ভই উল্লেখ করেন। এ থেকে জানা যায়, ঈমান ও ইসলাম এক এবং অভিন্ন। এবং উভয়টি ভিন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত এই আয়াত–

قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا -

অর্থাৎ, গেঁয়োরা বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। বলুন ঃ তোমরা ঈমান আননি; বরং বল ঃ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।

অর্থাৎ আমরা বাহ্যিক আনুগত্য কবুল করেছি। এখানে ঈমান অর্থ কেবল অন্তরের সত্যায়ন এবং ইসলাম অর্থ মৌখিক সত্যায়ন। হাদীসে জিব্রাঈলে আছে, যখন তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ঈমান কি জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন ঃ বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব ও রসূলগণের প্রতি, কেয়ামত দিবসের প্রতি এবং এ বিষয়ের প্রতি যে, ভাল ও মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। এরপর প্রশ্ন হল ঃ ইসলাম কি? জওয়াবে তিনি এ পাঁচটি বিষয়ই উল্লেখ করে বললেন, এগুলো কথায় ও কাজে স্বীকার করার নাম ইসলাম। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের হাদীসে আছে, রসূলে করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন এবং অন্য এক ব্যক্তিকে তা দিলেন না। হযরত সা'দ (রাঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এ ব্যক্তিকে দিলেন না, অথচ সে মুমিন? তিনি বললেন ঃ সে মুমিন নয়, মুসলিম। দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করা হলেও তিনি এবই জওয়াব দিলেন।

ঈমান ও ইসলাম একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত হচ্ছে

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ সর্বোত্তম আমল কোন্টি? তিনি বললেন ঃ ইসলাম। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ কোন্ ইসলাম উত্তম? তিনি বললেন ঃ ঈমান। এ থেকে জানা গেল, উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন এবং একটি অপরটির অন্তর্ভুক্তও বটে। এটা অভিধানের দিক দিয়ে ব্যবহারে সর্বোত্তম। কেননা, ঈমান হচ্ছে আমলসমূহের মধ্যে একটি সর্বোত্তম আমল। আর ইসলাম মেনে নেয়ার নাম, অন্তর দ্বারা হোক, মুখে হোক অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা হোক। এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে অন্তর দিয়ে মেনে নেয়া। অন্তরের এ মেনে নেয়াই তসদীক তথা সত্যায়ন, যাকে ঈমান বলা হয়।

তৃতীয় প্রকার আলোচনা শরীয়তগত বিধান সম্পর্কে। ঈমান ও ইসলামের শরীয়তগত বিধান দু'টি– একটি ইহলৌকিক, অপরটি পারলৌকিক। পারলৌকিক বিধান হচ্ছে জাহান্নামের অগ্নি থেকে বের করা এবং তাতে চিরকাল থাকার পথে প্রতিবন্ধক হওয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان -

অর্থাৎ, "যার অন্তরে কণা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে জাহান্নাম থেকে বের হবে।"

এতে মতভেদ রয়েছে যে, জাহান্নাম থেকে বের হওয়া কোন্ ঈমানের ফল? কেউ বলে, কেবল বিশ্বাস করলেই এ ফল অর্জিত হবে। কেউ বলে, এ ঈমান হচ্ছে অন্তরে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকারোক্তি করা। আবার কেউ এর সাথে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল করাকেও যোগ করে। বাস্তব কথা, যার মধ্যে এ তিনটি গুণই পাওয়া যাবে, তার সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। তার ঠিকানা নিশ্চিতই জান্নাত হবে। যার মধ্যে দু'টি গুণ পাওয়া যাবে এবং অল্প বিস্তর আমলও পাওয়া যাবে, একটি অথবা অধিক কবীরা গোনাহও সে করবে, তার সম্পর্কে মুতাযেলীরা বলে, সে ঈমানের বাইরে কিন্তু কুফরের মধ্যে দাখিল নয়, তার নাম ফাসেক। সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। মুতাযেলীদের এ উক্তি বাতিল। যার মধ্যে আন্তরিক বিশ্বাস পাওয়া যায়, কিন্তু মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আমল করার পূর্বেই মারা যায়, সে নিজের কাছে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করে। সে জাহান্নাম থেকে বের হবে। কেননা, তার অন্তর ঈমানে পূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায়

পবিত্রতার তাৎপর্য

প্রকাশ থাকে যে, পবিত্রতার শ্রেষ্ঠত্ব নিম্নোদ্ধৃত হাদীস ও আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ بنى الدين على النظافة ধর্ম পরিচ্ছন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। مفتاح الصلوة الطهور নামাযের চাবি পবিত্রতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ -

অর্থাৎ, "এ মসজিদে এমন লোক রয়েছে, যারা পবিত্র থাকা পছন্দ করে। আল্লাহ পবিত্র লোকদেরকে ভালবাসেন।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন الطهور نصف الايمان অর্থাৎ, পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ -

অর্থাৎ, "আল্লাহ তোমাদের উপর কোন অসুবিধা রাখতে চান না, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান।"

অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আলেমগণ এসব রেওয়ায়েত থেকে এ তথ্য উদঘাটন করেছেন যে, মানুষের অভ্যন্তরকে পবিত্র করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, "পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান।" এ বাক্যের উদ্দেশ্য এরূপ হওয়া অবান্তর যে, মানুষ তার বাহ্যিক অঙ্গে পানি ঢেলে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেবে আর তার অভ্যন্তরীণ অঙ্গ ময়লা অপবিত্রতা দ্বারা কলুষিত থাকবে। বরং উদ্দেশ্য, পবিত্রতা সম্পর্কিত কাজ। পবিত্রতার প্রকার চতুষ্টয় এই ঃ (১) বাহ্যিক দেহ ইত্যাদিকে বেওযুজনিত অপবিত্রতা ও আবর্জনা থেকে পাক করা, (২) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ্ ও পাপ থেকে পাক করা, (৩) অন্তরকে অসচ্চরিত্রতা ও কুঅভ্যাস থেকে পাক করা এবং (৪) বাতেন তথা অভ্যন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু থেকে পাক করা। এ শেষোক্ত প্রকারটি পয়গম্বর ও সিদ্দীকগণের বৈশিষ্ট্য। এখন প্রত্যেক প্রকারের যে অর্ধেক কাজ পবিত্রতা, তা এভাবে যে, চতুর্থ প্রকারের চরম লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য মহিমা মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়ে যাওয়া। প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী মারেফত অন্তরে কখনও অনুপ্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সবকিছু অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে। এজন্যেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ -

অর্থাৎ, "বলুন, আল্লাহ্। এরপর তাদেরকে তাদের ধ্যান-ধারণায় খেলা করতে দিন।"

কেননা, এ উভয়টি এক অন্তরে একত্রিত হয় না। কোন মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা দু'অন্তর সৃষ্টি করেননি যে, একটির মধ্যে খোদায়ী মারেফত থাকবে আর অপরটির মধ্যে গায়রুল্লাহ তথা অন্য কিছু থাকবে। সুতরাং অন্তর অন্য কিছু থেকে পাক করা এবং খোদায়ী মারেফত আসা দু'টি কাজ, যার অর্ধেক হল অন্তরকে পাক করা।

অনুরূপভাবে তৃতীয় প্রকারের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, অন্তরের প্রশংসনীয় চরিত্র ও শরীয়তী বিশ্বাস দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়া। বলাবাহুল্য, অন্তর এগুলো দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ বিপরীত কুচরিত্র ও মন্দ বিশ্বাস থেকে পাক না হবে। সুতরাং এখানেও দু'টি বিষয় হল, যার অর্ধেক অন্তরকে পাক করা।

এমনিভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে পাক করা এক কথা এবং এবাদত ও আনুগত্য দ্বারা পূর্ণ করা অন্য কথা। সুতরাং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাক করা হল সেই আমলের অর্ধেক, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা হওয়া উচিত। বাহ্যিক পবিত্রতাকেও এর মতই মনে করা উচিত। এভাবেই পবিত্রতাকে অর্ধেক ঈমান বলা হয়েছে।

মোট কথা, এগুলো হচ্ছে ঈমানের বিভিন্ন মকাম বা স্তর। প্রত্যেক মকামের একটি পর্যায় আছে। বান্দা নীচের পর্যায় অতিক্রম না করা পর্যন্ত উপরের পর্যায়ে কিছুতেই পৌছতে পারে না। উদাহরণতঃ অন্তরকে

নিন্দনীয় চরিত্র থেকে পাক করা এবং প্রশংসনীয় চরিত্র দ্বারা পূর্ণ করার পর্যায়ে পৌঁছা যাবে না, যে পর্যন্ত না নিন্দনীয় চরিত্র থেকে অন্তরকে পবিত্র করা হবে। আর যেব্যক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে পাক করে এবাদতে ব্যাপৃত না করবে, সে অন্তরের পবিত্রতার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না। উদ্দেশ্য যত প্রিয় ও শুভ হয়, তার পথ ততই কঠিন ও দীর্ঘ হয়, তাতে অনেক দুর্গম ঘাঁটি থাকে। তোমার এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, এসব বিষয় আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অর্জিত হয় এবং অধ্যবসায় ছাড়াই লাভ করা যায়। যার অন্তর্দৃষ্টি এসব পর্যায় দেখার ব্যাপারে অন্ধ, সে কেবল বাহ্যিক পবিত্রতাকেই পবিত্রতা মনে করে। সে একেই লক্ষ্য ও উদ্দিষ্ট মনে করে, এ নিয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করে এবং এর পদ্ধতিতে বাড়াবাড়ি করে। সে তার সমস্ত সময় এস্তেঞ্জা, কাপড় ধোয়া, বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা এবং পর্যাপ্ত প্রবাহিত পানির সন্ধানে ব্যয় করে দেয়। সে জানে না, পূর্ববর্তী মনীষীগণ তাঁদের সমস্ত শক্তি ও চিন্তা অন্তর পবিত্র করার কাজে ব্যাপৃত রাখতেন এবং বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব প্রদর্শন করতেন না। কাজেই হযরত ওমর (রাঃ) বিশেষ উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও জনৈকা খৃষ্টান মহিলার কলসী থেকে পানি নিয়ে ওযু করেছিলেন। তাঁরা মসজিদে ফরাশ ছাড়া নামায পড়তেন এবং খালি পায়ে পথ চলতেন। যিনি কিছু না বিছিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়তেন, তিনি শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গ বলে গণ্য হতেন। তাঁরা কেবল ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করতেন। হযরত আবু হোরায়রা ও অন্যান্য সুফফাবাসী সাহাবী বলেন ঃ আমরা ভাজা করা গোশত খেতাম এবং নামাযের তকবীর হয়ে গেলে কংকরের মধ্যে অঙ্গুলি ঘষে নিয়ে নামাযে শরীক হয়ে যেতাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র আমলে আমরা "উশনান" (সাবান জাতীয় ঘাস) কি জিনিস, জানতাম না। আমাদের পায়ের তলা হত আমাদের রুমাল। চর্বিযুক্ত কিছু খেলে পায়ের তালুতে হাত ঘষে নিতাম। কথিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলের পর প্রথমে চারটি বস্তু আবিষ্কৃত হয়– চালনি, উশনান, দস্তরখান ও পেট ভরে আহার।

মোট কথা, পূর্ববর্তীদের মনোযোগ কেবল অন্তরের পরিচ্ছন্নতার দিকে ছিল। তাঁদের কেউ কেউ এমনও বলেন যে, জুতা পায়ে রেখে নামায পড়া উত্তম। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন জুতা খুলে নামায

পড়েছিলেন, যখন জিব্রাঈল (আঃ) এসে জুতার মধ্যে নাপাকী লেগে থাকার সংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁকে জুতা খুলতে দেখে যখন মুসল্লীরাও জুতা খুলতে শুরু করে, তখন তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা জুতা খুললে কেন? এসব বাহ্যিক বিষয়সমূহের ব্যাপারে পূর্ববর্তীরাও কড়াকড়ির পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু আজকাল ঔদ্ধত্যের নাম রাখা হয়েছে পরিচ্ছন্নতা। এখন একেই ধর্মের ভিত্তি বলা হয়। অথচ অন্তর অহংকার, আত্মম্ভরিতা, রিয়া ও নেফাকের আবর্জনায় পরিপূর্ণ। এগুলোকে খারাপ মনে করা হয় না। যদি কোন ব্যক্তি কেবল ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করে অথবা খালি পায়ে পথ চলে অথবা মসজিদের মাটিতে জায়নামায ছাড়াই নামায পড়ে, তবে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় এবং তাকে অপবিত্র আখ্যা দেয়া হয়। সোবহানাল্লাহ, বিনয় ও আড়ম্বরহীনতা– যা ঈমানের অঙ্গ, তাকে বলা হয় নাপাকী আর গর্ব ও ঔদ্ধত্যকে বলা হয় পবিত্রতা।

এখানে আমরা কেবল বাহ্যিক পরিত্রতা বর্ণনা করব, যা তিন প্রকার ঃ (১) বাহ্যিক নাপাকী থেকে পাক হওয়া, (২) হুকমী নাপাকী, যাকে "হদস" (বেওযু অবস্থা) বলা হয়, তা থেকে পাক হওয়া এবং (৩) দেহের উচ্ছিষ্ট থেকে পাক হওয়া।

প্রথম প্রকার– বাহ্যিক নাপাকী থেকে পাক হওয়া প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় দেখতে হবে ঃ (১) যে নাপাকী দূর করা হবে, (২) যে বস্তু দ্বারা দূর করা হবে এবং (৩) যে উপায়ে দূর করা হবে।

প্রথম বিষয়– যে নাপাকী দূর করা হবে তা তিন প্রকার– জড় পদার্থ, অর্থাৎ, নিষ্প্রাণ বস্তু, প্রাণী এবং প্রাণীর অংশ বিশেষ।

জড় পদার্থের মধ্যে শরাব ও নেশার বস্তু ছাড়া সবকিছু পাক। প্রাণীর মধ্যে কুকুর, শূকর ও এতদুভয় থেকে উৎপন্ন বস্তু ছাড়া সব পাক। প্রাণী মারা গেলে পাঁচটি প্রাণী ব্যতীত সব নাপাক। পাঁচটি প্রাণী এই ঃ মানুষ, মাছ, ঝিনুক, শামুকের পোকা (খাদ্যে যেসব পোকা পড়ে, সেগুলো এর মধ্যে দাখিল)। যে প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নেই; যেমন মাছি, এগুলো পানিতে পড়ে গেলে পানি নাপাক হবে না। প্রাণীর অংশ বিশেষ দু'প্রকার– এক, যা প্রাণী থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এর বিধান মৃতের মতই। কিন্তু কেশ আলাদা হলে নাপাক হয় না। অস্থি নাপাক হয়ে যায়। দুই, যে তরল পদার্থ প্রাণীর অভ্যন্তর থেকে বের হয়। এর মধ্যে যেগুলো পরিবর্তিত হয়

না এবং নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে না, সেগুলো পাক; যেমন অশ্রু, ঘর্ম, থুথু। আর যেগুলোর ঠিকানা নির্দিষ্ট এবং পরিবর্তিত হয়, সেগুলো নাপাক; যেমন রক্ত, পুঁজ, পায়খানা, পেশাব সকল প্রাণীরই নাপাক। এসব নাপাকী অল্প হোক কিংবা বেশী, মাফ নেই। কিন্তু পাঁচটি বস্তু অল্প হলে মাফ- (১) ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করার পর যদি নাপাকীর কিছু অংশ থেকে যায় এবং বের হওয়ার স্থান অতিক্রম না করে, তবে মাফ। (২) রাস্তায় চলতে যে কাদা স্বাভাবিকভাবে শরীরে লেগে যায় বা রাস্তার ধুলোবালি হলে মাফ। কিন্তু যতটুকু থেকে বেঁচে থাকা কঠিন, ততটুকু মাফ। (৩) চামড়ার মোজার তলায় যে নাপাকী লেগে যায়, তা ঘষে নেয়ার পর মাফ। (৪) মশা-মাছির রক্ত অল্প হোক কিংবা বেশী, কাপড়ে লেগে গেলে মাফ। (৫) গায়ের রক্ত, পুঁজ ও বদরক্ত মাফ। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) একবার ব্রন ঘষে দেন। তা থেকে রক্ত বের হয়। কিন্তু তিনি তা না ধুয়ে নামায পড়ে নেন। এই পাঁচ প্রকার নাপাকীর ব্যাপারে শরীয়তের শিথিল বিধান থেকে তোমার জানা উচিত যে, পবিত্রতার ব্যাপারটি সহজভিত্তিক। এ সম্পর্কে নতুন যা আবিষ্কৃত হয়েছে, তা কেবল মনের ভিত্তিহীন কুমন্ত্রণা।

দ্বিতীয় বিষয়- যে বস্তু দ্বারা নাপাকী দূর করা হবে, তা দু'প্রকার ঃ জড় পদার্থ ও তরল পদার্থ। জড় পদার্থ হচ্ছে এস্তেঞ্জার ঢেলা, এটা শুষ্ক করে পাক করে দেয়। এ বস্তুটি শক্ত হওয়া, পবিত্র হওয়া, নাপাকী শুষে নেয়া এবং নিজে হারাম না হওয়া শর্ত। তরল পদার্থের মধ্যে পানি ছাড়া অন্য কোন বস্তু নাপাকী দূর করতে পারে না। সে-ই নাপাকী দূর করে, যে নিজে পাক এবং যা অনাবশ্যক বস্তু মিশ্রিত হওয়ার কারণে বেশী পরিমাণে পরিবর্তিত না হয়ে যায়। যদি পানিতে নাপাকী মিশ্রিত হওয়ার কারণে পানির স্বাদ অথবা রং অথবা গন্ধ বদলে যায়, তবে সেই পানি পাক থাকে না। যদি এই গুণত্রয়ের মধ্যে একটিও পরিবর্তিত না হয়, তবে সেই পানি নাপাক হবে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে, পানির পরিমাণ নয় মশক অথবা সোয়া ছয় মণ হলে পানি নাপাক হবে না। কিন্তু প্রবাহিত পানি যদি নাপাকী পড়ার কারণে বদলে যায়, তবে যতটুকু বদলে যায়, ততটুকু নাপাক। এর উজান ও ভাটির পানি নাপাক নয়।

তৃতীয় বিষয়- নাপাকী দূর করার উপায়, যদি নাপাকী এমন হয় যা

দেখা যায় না, তা যেখানে পড়ে, সেখানে পানি ঢেলে দেয়া যথেষ্ট। নাপাকী শরীরবিশিষ্ট হলে তা দূর করা জরুরী। যতক্ষণ তার স্বাদ বাকী থাকবে, ততক্ষণ শরীর বাকী আছে বুঝতে হবে। রং বাকী থাকার অবস্থাও তদ্রূপ। কিন্তু রং যদি চিমটে যায় এবং ঘষা দেয়ার পরও না উঠে, তবে মাফ। গন্ধ থাকা নাপাকী বাকী থাকার দলীল। এটা মাফ নয়। মনের কুমন্ত্রণা দূর করার জন্যে মনে করতে হবে যে, সকল বস্তু পবিত্র সৃজিত হয়েছে। অতএব যে কাপড়ের উপর নাপাকী দেখা যায় না এবং নাপাক বলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় না, তা নিয়ে নামায পড়ে নেবে। এখানে নাপাকীর পরিমাণ খোঁজাখুঁজি করার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় প্রকার- হদস থেকে পাক হওয়ার মধ্যে ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে এস্তেঞ্জা।

পায়খানা করার রীতি-নীতিতে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত সেগুলো এই ঃ মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে জঙ্গলে যেতে হবে। সম্ভব হলে কোন কিছুর আড়ালে বসতে হবে। বসার জায়গায় না পৌঁছা পর্যন্ত গুপ্তস্থান খুলবে না। সূর্য, চন্দ্র ও কেবলার দিকে মুখ করে এবং পিঠ ফিরে বসবে না। মানুষ যেখানে বসে কথাবার্তা বলে, সেখানে পায়খানা পেশাব করা থেকে বিরত থাকবে। স্থির পানি, ফলন্ত বৃক্ষের নীচে এবং গর্তে প্রস্রাব করবে না। যেদিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয় সেদিকে ফিরে প্রস্রাব করবে না। বসার মধ্যে বাম পায়ের উপর জোর দেবে। বাড়ীতে নির্মিত পায়খানায় গেলে ভেতরে যাওয়ার সময় বাম পা প্রথমে রাখবে এবং বাইরে আসার সময় ডান পা প্রথমে বের করবে। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন- একথা তোমাকে কেউ বললে তাকে সত্যবাদী মনে করবে না। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে দেখে বললেন ঃ হে ওমর! দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করো না। ওজরবশতঃ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার অনুমতি আছে। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন। আমি তাঁর জন্যে ওযুর পানি আনলে তিনি ওযু করলেন ও মোজার উপর মসেহ করলেন। গোসলের জায়গায় প্রস্রাব করবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মনের অধিকাংশ কুমন্ত্রণা এ থেকেই হয়। ইবনে মোবারক বলেন ঃ প্রবাহিত পানি হলে

তাতে প্রসাব করতে দোষ নেই। পায়খানায় এমন কোন বস্তু সাথে নিয়ে যাবে না যাতে আল্লাহ অথবা তাঁর রসূলের নাম লেখা থাকে। উলঙ্গ মাথায় পায়খানায় যাবে না। পায়খানায় যাওয়ার সময় এই দোয়া পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ

অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করছি। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই হীন নাপাকী তথা বিতাড়িত শয়তান থেকে।

বের হওয়ার সময় এই দোয়া পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنِّيْ مَا يُؤْذِيْنِيْ وَاَبْقٰى عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِيْ ـ

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দিয়েছেন এবং উপকারী বস্তু আমার মধ্যে রেখেছেন। এ দোয়া পায়খানার বাইরে এসে বলতে হবে।

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের.কে সবকিছু শিখিয়েছেন। এমনকি পায়খানা-প্রস্রাবের রীতিনীতি পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে এস্তেঞ্জায় হাড্ডি ও গোবর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং প্রস্রাব-পায়খানায় কেবলার দিকে মুখ করতে বারণ করেছেন।

জনৈক বেদুঈন এক সাহাবীর সাথে ঝগড়া করে বলল, আমি জানি তুমি ভালরূপে পায়খানাও করতে পার না। সাহাবী জওয়াবে বললেন ঃ কেন জানব না? আমি তো এ ব্যাপারে পারদর্শী। আমি পথ থেকে দূরে চলে যাই, ঢেলা ব্যবহার করি, ঝোঁপের দিকে মুখ করি, বাতাসের দিকে পিঠ করি, পায়ের গোড়ালির উপর জোর দেই এবং নিতম্ব উপরে রাখি।

অন্য কোন লোকের কাছে তাকে আড়াল করে প্রস্রাব করাও জায়েয। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন। তা সত্ত্বেও উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশে এরূপ করেছেন।

এস্তেঞ্জার নিয়ম হচ্ছে, পায়খানা শেষ হলে পর তিনটি ঢেলা দিয়ে নাপাকী পরিষ্কার করবে। সাফ হয়ে গেলে ভাল, নতুবা চতুর্থ ঢেলা ব্যবহার করবে। অনুরূপভাবে প্রয়োজন হলে পঞ্চম ঢেলা নিতে হবে। কেননা, পাক-সাফ করা ওয়াজেব। তবে বিজোড় সংখ্যক ঢেলা ব্যবহার করা মোস্তাহাব। হাদীসে আছে, যে ঢেলা ব্যবহার করে, সে যেন বিজোড় সংখ্যক ব্যবহার করে। প্রথম ঢেলা বাম হাতে নিয়ে পায়খানার রাস্তার সামনের দিকে রাখবে এবং ঘষে পেছনের দিকে নিয়ে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় ঢেলা নিয়ে পেছনের দিকে রাখবে এবং ঘষে সামনের দিকে আনবে। তৃতীয় ঢেলাটি নিয়ে পায়খানার রাস্তার চারপাশে ঘুরাবে। এরপর একটি বড় ঢেলা ডান হাতে নিয়ে বাম হাতে পুরুষাঙ্গ ধরে মুছে দেবে এবং তিন বার তিন জায়গায় মুছবে। চার ঢেলায় সাফ হয়ে গেলে বিজোড় করার জন্যে পঞ্চম ঢেলা ব্যবহার করবে। এরপর সেই স্থান থেকে সরে অন্যত্র বসে পানি ব্যবহার করবে। ডান হাতে পানি নিয়ে নাপাকীর স্থানে ঢালবে এবং বাম হাতে মুছে দেবে। এস্তেঞ্জা শেষে এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرْجِيْ مِنَ الْفَوَاحِشِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে নেফাক থেকে পবিত্র করুন এবং আমার লজ্জাস্থানকে অশ্লীলতা থেকে হেফাযতে রাখুন।

এরপর গন্ধ থেকে গেলে হাত প্রাচীরে অথবা মাটিতে ঘষে ধুয়ে নেবে। এস্তেঞ্জায় ঢেলা ও পানি উভয়টি ব্যবহার করা মোস্তাহাব।

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ـ

অর্থাৎ "ঐ মসজিদে এমন লোক রয়েছে, যারা অধিকতর পবিত্র থাকা পছন্দ করে। আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন।"

বর্ণিত আছে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোবা মসজিদের মুসল্লীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা এমন কি পবিত্রতা অর্জন কর, যার জন্যে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রশংসা করেছেন? তারা

আরজ করল ঃ আমরা এস্তেঞ্জায় ঢেলা ও পানি উভয়টি ব্যবহার করি।

এস্তেঞ্জা সমাপ্ত হলে পর ওযু করবে। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এরূপ কখনও দেখা যায়নি যে, তিনি প্রস্রাব-পায়খানা শেষে ওযু করেননি। মেসওয়াক দ্বারা ওযু শুরু করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের মুখ কোরআনের পথ। একে মেসওয়াক দ্বারা পরিচ্ছন্ন করে নাও। মেসওয়াক করার সময় নিয়ত করবে, নামায, কোরআন তেলাওয়াত ও যিক্‌রুল্লাহর জন্যে মুখকে পবিত্র করছ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মেসওয়াকের পরের নামায মেসওয়াক ছাড়া পচাত্তর রাকআত নামাযের চেয়ে উত্তম। তিনি আরও বলেন ঃ

لو لا اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلوة -

অর্থাৎ, "আমার উম্মতের জন্যে কঠিন হবে, এরূপ আশংকা না থাকলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"

রসূলে করীম (সাঃ) রাত্রে কয়েক বার মেসওয়াক করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে সব সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতেন। এমনকি, আমাদের ধারণা হল যে, এ সম্পর্কে বোধ হয় তাঁর প্রতি সত্বরই কোন আয়াত নাযিল হবে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ মেসওয়াক জরুরী করে নাও। এটা মুখ পরিষ্কার করে এবং এতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ মেসওয়াক স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে এবং শ্লেষ্মা দূর করে। দাঁতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয় দিকে মেসওয়াক করবে। একদিকে করলে তা প্রস্থে করবে। প্রত্যেক নামায ও ওযুর সময় মেসওয়াক করবে, যদিও ওযুর পরে নামায পড়া না হয়। নিদ্রা অথবা অনেকক্ষণ ঠোঁট বন্ধ রাখা অথবা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খাওয়ার কারণে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে মেসওয়াক করবে।

মেসওয়াক শেষ হলে পর ওযুর জন্যে কেবলামুখী হয়ে বসবে এবং "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বলবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে বিসমিল্লাহ বলে না, তার ওযু হয় না, অর্থাৎ পূর্ণ ওযু হয় না। অতঃপর বলবে ঃ

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ -

অর্থাৎ "হে পরওয়ারদেগার! আমি আপনার কাছে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাই এবং হে পরওয়ারদেগার! আমার কাছে শয়তানদের আগমন থেকে আপনার আশ্রয় চাই।"

এর পর পানির পাত্রে হাত দেয়ার পূর্বে কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধৌত করবে এবং বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّؤْمِ وَالْهَيْبَةِ -

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে বরকত চাই এবং অমঙ্গল ও ধ্বংস থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

এর পর হদস দূর করার এবং এই ওযু দ্বারা নামায বৈধ হওয়ার নিয়ত করবে। মুখ ধোয়া পর্যন্ত এই নিয়ত বাকী রাখবে। মুখ ধোয়ার সময় পর্যন্ত ওযুর কথা ভুলে গেলে ওযু পূর্ণ হয় না। এর পর মুখের জন্যে অঞ্জলিতে পানি নেবে এবং তিন বার কুলি ও গরগরা করবে। রোযাদার হলে গরগরা করবে না। এরপর এই দোয়া পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ لَكَ -

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আপনার কিতাব তেলাওয়াত এবং আপনার অধিক যিকির করার কাজে আমাকে সাহায্য করুন।"

এরপর নাকের জন্যে অঞ্জলি ভরবে এবং তিন বার নাকে পানি দিয়ে শ্বাস টেনে নাকের ছিদ্রের ভেতর নিয়ে যাবে। এরপর পানি বের করে দেবে। নাকে পানি দেয়ার সময় এই দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِىْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنِّىْ رَاضٍ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতের সুঘ্রাণ শুঁকতে দিন এমতাবস্থায় যে, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট।

নাক ঝাড়ার সময় বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ رَوَائِحِ النَّارِ وَمِنْ سُوْءِ الدَّارِ .

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দোযখের দুর্গন্ধ থেকে আশ্রয় চাই এবং মন্দ গৃহ থেকে।

এরপর মুখমণ্ডলের জন্যে পানি নেবে এবং কপালে চুল উঠার জায়গা থেকে চিবুক পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে এবং এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত প্রস্থে তিন বার ধৌত করবে। কপালের যে দুই প্রান্ত চুল উঠে ভেতরে চলে যায়, তা মুখমণ্ডলের সীমার মধ্যে দাখিল নয়; বরং তা মাথার অন্তর্ভুক্ত। কানের উভয় লতির উপরও পানি পৌঁছানো উচিত। ভ্রূ, গোঁফ, গুচ্ছ ও পলক এই চার প্রকার চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো উচিত। কেননা, এগুলো অধিকাংশ লোকের অল্পই হয়। দাড়ি পাতলা হলে গোড়ায় পানি পৌঁছাতে হবে। পাতলা হওয়ার আলামত হচ্ছে ত্বক দৃষ্টিগোচর হওয়া। পক্ষান্তরে ঘন দাড়ি হলে গোড়ায় পানি পৌঁছানো জরুরী নয়। চক্ষু অঙ্গুলি দ্বারা সাফ করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ করেছেন। চক্ষু সাফ করার সময় নিয়ত করবে যেন, এতে চক্ষুর গোনাহ দূর হয়ে যাবে। এমনিভাবে সকল অঙ্গ ধোয়ার সময় প্রত্যাশা করবে। মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ بِنُوْرِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ اَوْلِيَائِكَ وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِىْ بِظُلُمَاتِكَ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوْهُ اَعْدَائِكَ .

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনার নূর দ্বারা আমার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় করুন, যেদিন আপনার ওলীদের মুখ জ্যোতির্ময় হবে এবং অন্ধকার দ্বারা আমার মুখ কালো করবেন না যেদিন আপনার শত্রুদের মুখ কাল হবে।

মুখ ধৌত করার সময় ঘন দাড়িতে খেলাল করা মোস্তাহাব। এরপর দুই কনুই পর্যন্ত উভয় হাত তিন বার ধৌত করবে। আংটি থাকলে তা নাড়াচাড়া করবে। পানি কনুইর উপর পর্যন্ত পৌঁছাবে। কেননা,

কেয়ামতের দিন ওযুকারীদের হাত, পা, মুখমণ্ডল ওযুর চিহ্নস্বরূপ উজ্জ্বল হবে। অতএব যত দূরে পানি পৌঁছবে, ততদূর পর্যন্তই উজ্জ্বল হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ من استطاع ان يطيل غرته فليفعل যে তার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করতে সক্ষম, সে যেন তা করে।

এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ

تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء .

অর্থাৎ, "ঈমানদারের অলংকার সেই স্থান পর্যন্ত পৌঁছবে যে পর্যন্ত ওযু পৌঁছবে।" প্রথমে ডান হাত ধৌত করবে এবং বলবে–

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا .

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দিন এবং আমার হিসাব সহজ করুন। বাম হাত ধৌত করার সময় বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تُعْطِيَنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ .

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার আমলনামা আমার বাম হাতে অথবা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হতে আমি আপনার আশ্রয় চাই।

অতঃপর সমস্ত মাথা মাসেহ্ করবে। উভয় হাত ভিজিয়ে উভয় হাতের অঙ্গুলির মাথা মিলিয়ে নেবে, এরপর কপালের কাছে মাথায় রেখে ঘাড়ের দিকে নিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে আবার সামনের দিকে টেনে আনবে। এটা হল এক মাসেহ। অনুরূপভাবে তিন বার মাসেহ্ করবে। অতঃপর বলবে–

اَللّٰهُمَّ غَشِّنِىْ بِرَحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَاَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ .

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাকে স্বীয় রহমত দ্বারা আবৃত করে নিন, আমার প্রতি বরকত নাযিল করুন এবং আমাকে আপনার আরশের

ছায়াতলে স্থান দিন। যেদিন আপনার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।"

এর পর উভয় কান ভিতরে ও বাইরে মাসেহ্ করবে। শাহাদতের উভয় অঙ্গুলি কানের ছিদ্রে ঢুকিয়ে উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের বাইরের দিকে ঘুরাবে। এ সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اَللّٰهُمَّ اَسْمِعْنِىْ مُنَادِىَ الْجَنَّةِ مَعَ الْاَبْرَارِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে তাদের একজন করুন যারা কথা শুনে, অতঃপর উত্তম কথার অনুসরণ করে। হে আল্লাহ, আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের সাথে জান্নাতের ঘোষকের আওয়াজ শুনান।

এর পর ঘাড় মাসেহ্ করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ঘাড়ের মাসেহ কেয়ামতের দিন বেড়ি থেকে রক্ষা করে। এ সময় এই দোয়া পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْاَغْلَالِ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমার ঘাড়কে দোযখ থেকে মুক্ত করুন। আমি আপনার কাছে শিকল ও বেড়ি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

এর পর ডান পা ধৌত করবে এবং বাম হাতে পায়ের অঙ্গুলির নীচের দিক থেকে খেলাল করবে। এ সময় এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِىْ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ فِى النَّارِ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্! আমার পা সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, যেদিন দোযখে মানুষের পদস্খলন ঘটবে।" বাম পা ধৌত করার সময় বলবে–

اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تَزِلَّ قَدَمِىْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ اَقْدَامُ الْمُنَافِقِيْنَ فِى النَّارِ ـ

অর্থাৎ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই পুলসেরাতে আমার পদস্খলন থেকে, যেদিন জাহান্নামে মোনাফেকদের পদস্খলন ঘটবে।"

পা ধোয়া শেষ হলে আকাশের দিকে মুখ তুলবে এবং বলবে–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَمِلْتُ سُوْۤءًا وَّظَلَمْتُ نَفْسِىْ اَسْتَغْفِرُكَ اَللّٰهُمَّ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ فَاغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ عَبْدًا شَكُوْرًا صَبُوْرًا وَاجْعَلْنِىْ اَذْكُرُكَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّاُسَبِّحُكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ـ

অর্থাৎ, "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! সপ্রশংস পবিত্রতা। কোন মা'বুদ নেই আপনি ছাড়া। আমি মন্দ কাজ করেছি এবং নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং আপনার কাছে তওবা করি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী দয়ালু। হে আল্লাহ,! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাকে পবিত্রদের অন্তর্ভুক্ত করুন, আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাকে কৃতজ্ঞ, ধৈর্যশীল বান্দায় পরিণত করুন এবং এমন করুন, যেন আমি আপনার অনেক যিকির করি এবং সকাল-সন্ধ্যায়

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি।

কথিত আছে, যেব্যক্তি ওযুর পর এই দোয়া পড়ে, তার ওযুর উপর মোহর এঁটে আরশের নীচে পৌঁছে দেয়া হয়। সেখানে এই ওযু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকে। তার সওয়াব কেয়ামত পর্যন্ত এ ব্যক্তির জন্যে লেখা হয়।

ওযুর মধ্যে কয়েকটি বিষয় মাকরূহ– (১) তিন বারের বেশী ধৌত করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন বার ধৌত করেছেন এবং বলেছেন ঃ যে বেশী বার ধৌত করে, সে জুলুম করে এবং মন্দ কাজ করে। তিনি আরও বলেন ঃ সত্বরই এ উম্মতের মধ্যে এমন লোকের উদ্ভব হবে, যারা দোয়া ও ওযুর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করবে। কথিত আছে, ওযুর মধ্যে বেশী পানির লোভ মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতার লক্ষণ। ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন ঃ কুমন্ত্রণার সূচনা প্রথমে পবিত্রতা থেকেই হয়েছে। হযরত হাসান বলেন ঃ এক শয়তান ওযুর মধ্যে মানুষের প্রতি হাসে। এই শয়তানের নাম "ওয়ালহান।" (২) পানি দূর হয়ে যাওয়ার জন্যে হাত ঝাড়া দেয়া। (৩) ওযুর মধ্যে কথা বলা। (৪) মুখে চপেটাঘাতের মত করে পানি নিক্ষেপ করা। (৫) কেউ কেউ ওযুর পানি শরীর থেকে মুছে শুকানোকেও মাকরূহ বলেছেন। কেননা, এ পানি আমলনামার পাল্লায় ওজন করা হবে। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব এবং যুহরী একথা বলেন। কিন্তু হযরত মুয়ায (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাপড়ের প্রান্ত দ্বারা মুখমণ্ডল থেকে ওযুর পানি মুছেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে একটি পানি শুকানোর কাপড় থাকত। (৬) কাঁসার পাত্র থেকে ওযু করা। (৭) রৌদ্রে উত্তপ্ত পানি দ্বারা ওযু করা।

ওযু শেষে নামাযের প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য মনে মনে চিন্তা করবে, আমার বাহ্যিক অঙ্গ যা মানুষ দেখে, তা পাক হয়ে গেছে। এখন অন্তর পবিত্র না করে আল্লাহর সাথে কথা বলা বড়ই লজ্জার বিষয়। অন্তর আল্লাহ দেখেন। এর পর অন্তর পাক করা, কুচরিত্র থেকে পবিত্র হওয়া এবং সচ্চরিত্রে ভূষিত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করবে। যেব্যক্তি কেবল বাহ্যিক অঙ্গ পবিত্র করাকেই যথেষ্ট মনে করে, সে সেই ব্যক্তির মত, যে বাদশাহকে গৃহে দাওয়াত করার পর গৃহাভ্যন্তর আবর্জনা ও ময়লাযুক্ত রেখে কেবল বাইরে চুনার লেপ দেয়। বলাবাহুল্য, এরূপ ব্যক্তি বাদশাহের বিরাগভাজনই হবে।

ওযুর ফযীলত

ওযুর ফযীলত সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হল–

من توضا فاحسن الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيهما بشئى من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه .

অর্থাৎ, যেব্যক্তি ওযু করে এবং সুন্দরভাবে ওযু করে, অতঃপর দুনিয়ার কোন কথা অন্তরে চিন্তা না করে দু'রাকআত নামায পড়ে, সে তার গোনাহ থেকে এমন নিষ্কৃতি পায়, যেমন সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন নিষ্পাপ ছিল।

الا انبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوضوء فى المكاره ونقل الاقدام الى المساجد وانتظار الصلوة بعد الصلوة فذالكم الرباط .

অর্থাৎ, "আমি তোমাদেরকে কি এমন বিষয় বলব না, যদ্দারা আল্লাহ তাআলা গোনাহ মার্জনা এবং মর্যাদা উঁচু করেন? তা হল, মনে চায় না এমন সময়ে পূর্ণরূপে ওযু করা, মসজিদের দিকে পা বাড়ানো এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা। এটা যেন আল্লাহর পথে জেহাদ করার জন্যে ঘোড়া প্রস্তুত রাখা।" শেষ বাক্যটি রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন বার বললেন।

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওযু করলেন এবং এক একবার অঙ্গসমূহ ধৌত করলেন। অতঃপর বললেন ঃ এটি এমন ওযু, যা ছাড়া আল্লাহ তাআলা নামায কবুল করেন না। এর পর তিনি দু'দু'বার অঙ্গ ধৌত করে ওযু করলেন এবং বললেন ঃ যেব্যক্তি দু'দু'বার অঙ্গ ধৌত করে ওযু করে, আল্লাহ তাআলা তাকে দু'বার সওয়াব দেবেন। অতঃপর তিনি তিন তিন বার অঙ্গ ধৌত করলেন এবং বললেন ঃ এটা আমার ওযু, আমার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের ওযু এবং আল্লাহর খলীল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ওযু। তিনি আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি ওযুর মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ

তার সমস্ত দেহ পাক করে দেন। আর যে স্মরণ না করে, তার দেহ কেবল পানি পৌঁছা পরিমাণ পাক হবে।

من توضا على طهر كتب الله به عشر حسنات .

অর্থাৎ, "যেব্যক্তি ওযুর উপর ওযু করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে দশটি সওয়াব লেখেন।"

الوضوء على الوضوء نور على نور .

অর্থাৎ "ওযুর উপর ওযু যেন নূরের উপর নূর।"

এ রেওয়ায়েতদ্বয় থেকে নতুন ওযুর উৎসাহ পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন বান্দা ওযু করে এবং কুলি করে তখন গোনাহ তার মুখ থেকে বের হয়ে যায়। যখন নাক সাফ করে, তখন নাক থেকে গোনাহ বের হয়; যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন মুখমণ্ডল থেকে গোনাহ দূর হয়; এমনকি চোখের পলকের নীচ থেকে গোনাহ বের হয়ে যায়। যখন হাত ধৌত করে, তখন হাত থেকে গোনাহ দূর হয়। এমনকি নখের নীচ থেকেও দূর হয়। যখন মাথা মাসেহ করে, তখন মাথা থেকে কান পর্যন্তের গোনাহ বের হয়ে যায়। এর পর যখন পা ধৌত করে, তখন উভয় পায়ের গোনাহ নখের নীচ থেকে পর্যন্ত দূর হয়ে যায়। এর পর তার মসজিদে গমন ও নামায পড়া উভয়টি অতিরিক্ত থাকে। বর্ণিত আছে– ওযুওয়ালা ব্যক্তি রোযাদারের মত। যেব্যক্তি ওযু করে এবং ভালরূপে করে, এর পর আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে বলে–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

তার জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে যায়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ উত্তম ওযু তোমা থেকে শয়তানকে দূর করে দেবে। মুজাহিদ বলেন ঃ যে করতে পারে, সে এটা করুক– নিদ্রা যাওয়ার সময় ওযু অবস্থায় যিকির করে ও এস্তেগফার পাঠ করে নিদ্রা যাবে। কেননা, আত্মা সেই অবস্থায় উত্থিত হবে যে অবস্থায় তাকে কবজ করা হবে।

গোসল

গোসলের নিয়ম হল, পানির পাত্রটি ডান পাশে রাখবে। প্রথমে বিসমিল্লাহ বলে হাত তিন বার ধৌত করবে। এর পর শরীরে নাপাকী থাকলে তা ধুয়ে নেবে। অতঃপর নামাযের মত ওযু করবে। কিন্তু তখন পা না ধুয়ে গোসলের শেষে পা ধৌত করবে। ওযু শেষ হলে তিন বার ডান কাঁধের উপর নীচ পর্যন্ত পানি ঢালবে। এর পর বাম কাঁধে তিন বার, মাথায় তিন বার পানি ঢালবে। অতঃপর শরীর সামনে ও পশ্চাদ্দিকে ঘষে দেবে। চুল ও দাড়ি খেলাল করবে। চুল ঘন হোক কিংবা পাতলা– গোড়ায় পানি পৌঁছাবে। মহিলাদের কেশের গোড়ায় পানি পৌঁছবে না বলে আশংকা হলে বিনুনি খুলতে হবে, নতুবা নয়। দেহের ভাঁজের ভেতরে পানি পৌঁছল কিনা দেখতে হবে। এভাবে ওযু করে গোসল করলে গোসলের পর পুনরায় ওযু করতে হবে না। আধ্যাত্ম পথের পথিকদের জন্যে ওযু গোসল সম্পর্কে এতটুকু জানা ও করা জরুরী। মাঝে মাঝে অন্য যেসব বিষয় জানার প্রয়োজন হয়, সেগুলো ফেকাহ্‌র কিতাবসমূহে দেখে নেয়া উচিত। গোসলের এসব বিষয়ের মধ্যে দু'টি বিষয় ওয়াজেব– নিয়ত করা ও সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছানো।

গোসল চার কারণে ওয়াজেব হয়– বীর্যপাতের কারণে, স্ত্রী সহবাসের কারণে, হায়েযের পরে এবং নেফাসের পরে। এছাড়া অন্য সকল গোসল সুন্নত। যেমন, ঈদের দিনে গোসল, এহরামের জন্যে, আরাফাত অথবা মুযদালেফায় অবস্থানের জন্যে, মক্কায় প্রবেশ করার জন্যে এবং আইয়ামে তাশরীকের তিন দিনের গোসল। এক উক্তি অনুযায়ী বিদায়ী তওয়াফের জন্যে গোসল করা, কাফের নাপাক না হলেও মুসলমান হওয়ার সময় গোসল করা, পাগলের জ্ঞান ফিরে আসার সময় গোসল করা এবং মৃতকে গোসল দেয়ার পর গোসলদাতা গোসল করা মোস্তাহাব।

তায়াম্মুম

পানি পাওয়া না গেলে অথবা হিংস্র জন্তু কিংবা শত্রুর ভয়ে পানি পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম না হলে অথবা শরীরে কোন ক্ষত থাকলে কিংবা রোগাক্রান্ত হলে এবং পানির ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করা জায়েয।

তায়াম্মুমের নিয়ম হচ্ছে, পাক ও নরম মাটির উপর উভয় হাতের অঙ্গুলি মিলিয়ে থাবা মারবে। এর পর উভয় হাত মুখমণ্ডলের উপর মালিশ করবে। তখন নামায বৈধ হওয়ার নিয়ত করবে। মুখমণ্ডলের সকল অংশে ধুলা পৌছাতে হবে। এরপর মাটির উপর দ্বিতীয় থাবা মারবে। অতঃপর ডান হাতের চার অঙ্গুলি পরস্পর মিলিয়ে বাম হাতের চার অঙ্গুলির উপর এভাবে রাখবে যে, বাম অঙ্গুলির ভিতরের দিক এবং ডান অঙ্গুলির পৃষ্ঠদেশ পরস্পর সংযুক্ত হবে। এর পর বাম হাতের চার অঙ্গুলিকে ডান হাতের পিঠের দিক দিয়ে কনুই পর্যন্ত ঘষতে ঘষতে নিয়ে যাবে। এতে হাতের তালু সংযুক্ত হবে না। কনুই পর্যন্ত পৌছার পর বাম হাতের তালু ডান হাতের ভেতরের দিকে ঘুরিয়ে কব্জি পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং বাম অঙ্গুলির ভেতরের দিক দিয়ে ডান বৃদ্ধাঙ্গুলির বাইরের দিকে মাসেহ করবে। অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর অনুরূপ আমল করবে। দু'থাবা দ্বারা হাতের সমস্ত অংশে ধুলা পৌছানো সম্ভব না হলে অধিক থাবা দেয়ায় দোষ নেই।

তৃতীয় প্রকার শরীরের বাহ্যিক আবর্জনা ও ময়লা ঃ আবর্জনা দু'প্রকার– ময়লা ও অতিরিক্ত অংশবিশেষ।

মানুষের মধ্যকার ময়লা আটটি ঃ (১) মাথার কেশের ময়লা ও উকুন। এগুলো ধোয়া, চিরুনি করা ও তেল দেয়ার মাধ্যমে পরিষ্কার করা মোস্তাহাব, যাতে কেশের এলোমেলো অবস্থা ও চেহারার আতংকভাব দূর হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাঝে মাঝে চুলে তেল দিতেন ও চিরুনি করতেন। তিনি মাঝে মাঝে তেল দেয়ার আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যার চুল আছে, তার উচিত চুলের পরিচর্যা করা। অর্থাৎ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি আগমন করল। তার দাড়ি ছিল বিক্ষিপ্ত এলোমেলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ চুল পরিপাটি করার জন্যে তোমার কাছে কি তেল ছিল না? এরপর বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ শয়তানের রূপ ধরে আগমন করে।

(২) কানের প্যাঁচে জমা ময়লা। এর মধ্যে যা উপরে থাকে তা মাসেহ দ্বারা দূর হয়ে যায়।

(৩) নাকের ভিতর জমাট ও শুকিয়ে যাওয়া তরল পদার্থ। নাকে পানি দিয়ে হাঁচি দিলে এগুলো দূর হয়ে যায়।

(৪) দাঁত ও জিহ্বার কিনারার ময়লা। এটা কুলি ও মেসওয়াক করলে দূর হয়।

(৫) দাড়ি পরিপাটি না করলে তাতে ময়লা ও উকুন জমা হয়ে যায়। এগুলো ধৌত ও চিরুনি করে দূর করা মোস্তাহাব। হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বদা সফরে ও গৃহে চিরুনি, দাঁতের মাজন ও আয়না সঙ্গে রাখতেন। এটা আরবদের সাধারণ রীতি। অন্য এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) দিনে দু'বার দাড়িতে চিরুনি করতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাড়ি ঘন ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দাড়িও তেমনি ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর দাড়ি দীর্ঘ ও পাতলা ছিল এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর দাড়ি খুব প্রশস্ত ছিল এবং উভয় কাঁধ আবৃত করে রাখত। এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ কিছু লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরজায় এসে সমবেত হলে তিনি তাদের কাছে যেতে মনস্থ করলেন। আমি দেখলাম, তিনি পানির মটকায় উঁকি মেরে চুল ও দাড়ি পরিপাটি করে নিলেন। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এ কাজ করলেন কেন? তিনি বললেন ঃ "হাঁ, আল্লাহ তাআলা এটা পছন্দ করেন যে, বান্দা যখন তার ভাইদের কাছে যাবে তখন সেজেগুজে যাবে।" মূর্খরা কখনও ধারণা করে, এটা লোক দেখানো সাজসজ্জার প্রতি মহব্বত, যা প্রশংসনীয় নয়। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্রকে অন্যের চরিত্রের মত মনে করে। অথচ এরূপ নয়। কেননা, তিনি দাওয়াতের কাজে আদিষ্ট ছিলেন। কাজেই মানুষের অন্তরে নিজেকে বড় করার চেষ্টা করা তাঁর জন্যে অপরিহার্য ছিল, যাতে তারা তাঁকে নিকৃষ্ট ও হেয় মনে না করে। তিনি যদি সেজেগুজে ও পরিপাটি হয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত না হতেন, তবে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট হয়ে যেতেন এবং মানুষ তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেত; মোনাফেকরা কুধারণা করার সুযোগ পেত। মানুষকে দাওয়াত দেয়ার কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক আলেমের উচিত ওয়াজ করার সময় নিজের বাহ্যিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং এমন কোন অবস্থা প্রকাশ না করা, যাতে মানুষ তাকে ঘৃণা করে। মোট কথা, এ বিষয়টি নিয়তের উপর ভিত্তিশীল। উল্লিখিত বিষয়ের নিয়তে সাজসজ্জা করা ভাল। আর যদি এই উদ্দেশে চুল এলামেলো রাখে যে, মানুষ তাকে দরবেশ মনে করবে, তবে এটা নিষিদ্ধ। যদি চুল পরিপাটি করার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধান পালনে মশগুল হওয়ার কারণে চুল পরিপাটি না

করে, তবে তা মন্দ নয়। এগুলো বান্দা ও আল্লাহ তাআলার মধ্যবর্তী বাতেনী অবস্থা। কেয়ামতে যখন বাতেনের পরীক্ষা নেয়া হবে, তখন নিয়তের সত্য মিথ্যা ফুটে উঠবে। আমরা সেদিনের লজ্জা থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

(৬) অঙ্গুলির উপর ভাঁজের মধ্যে যে ময়লা জমা হয়, আরবরা তা খুব ধৌত করত। কেননা, তারা আহারের পর হাত ধৌত করত না। ফলে এসব ভাঁজের মধ্যে ময়লা থেকে যেত। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এসব স্থান ধৌত করার আদেশ দিয়েছেন।

(৭) অঙ্গুলির অগ্রভাগে নখের ময়লা দূর করার আদেশ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দিয়েছেন। কারণ, সব সময় নখ কাটা সম্ভবপর নয় বিধায় নখের নীচে ময়লা জমে যায়। এজন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) নখ কাটা, বগল ও নাভির নীচের লোম দূর করার জন্যে সর্বোচ্চ চল্লিশ দিনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার ওহী অবতরণে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়। এর পর জিব্রাঈল (আঃ) এসে আরজ করলেন ঃ আপনি অঙ্গুলির মধ্যবর্তী ভাঁজ ধৌত করেন না, নখের ময়লা পরিষ্কার করেন না এবং দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্যে মেসওয়াক করেন না, এমতাবস্থায় আমি আপনার কাছে কিরূপে আসতে পারি? আপনি উম্মতকে এসব কাজ করতে বলে দিন! কতক আলেম فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ (পিতামাতাকে উফ্ বলো না) আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ 'উফ্' নখের ময়লাকে এবং তুফ কানের ময়লাকে বলা হয়। আয়াতের অর্থ, পিতামাতাকে নখের ময়লার সমান গণ্য করো না। কেউ কেউ বলেন ঃ তাদেরকে এতটুকু কষ্ট দিও না যতটুকু কষ্ট নখের নীচে ময়লা জমে গেলে হয়।

(৮) সমস্ত শরীরে ঘর্ম ও পথের ধুলাবালি থেকে যে ময়লা জমে, এটা গরম পানি দ্বারা গোসল করে দূর করা যায়। হাম্মামে গোসল করায়ও কোন দোষ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণও সিরিয়ার হাম্মামসমূহে গোসল করেছেন। হযরত আবু দারদা ও আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ হাম্মাম ভাল জায়গা, শরীর পবিত্র করে এবং জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার কারও মতে হাম্মাম মন্দ জায়গা, উলঙ্গতা প্রকাশ করে এবং লজ্জা-শরম দূর করে। সত্য কথা,

হাম্মামের অশুভ ক্রিয়াকলাপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে এর উপকারিতা লাভ করার মধ্যে কোন দোষ নেই।

মানুষের শরীরের অতিরিক্ত অংশ আটটি। এগুলো দূর করা উচিত।

(১) মাথার চুল। যেব্যক্তি পরিচ্ছন্নতা কামনা করে, তার উচিত মাথার চুল মুণ্ডন করা। আর যেব্যক্তি তেল দেয় ও চিরুনি করে, সে তা রেখে দিতে পারে। কিন্তু মাথার কোথাও চুল রাখা এবং কোথাও না রাখা, যেমন টিকি রাখা– এটা জায়েয নয়। এটা দুশ্চরিত্রদের রীতি।

(২) গোঁফের চুল। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

قصوا الشوارب واعفوا اللحى -

গোঁফ কাট এবং দাড়ি ছেড়ে দাও। এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ

جزوا الشوارب حفوا الشوارب -

এর অর্থ, গোঁফ ঠোঁটের উপর পর্যন্ত কেটে নাও। গোঁফ মুণ্ডন করার কথা কোন হাদীসে বর্ণিত নেই। তবে মুণ্ডনের কাছাকাছি করে কাটা সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত আছে। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার গোঁফ লম্বা দেখে বললেন ঃ আমার কাছে এস। অতঃপর তিনি আমার ঠোঁটের উপর মেসওয়াক রেখে গোঁফ কেটে দিলেন। গোঁফের দুই প্রান্তের চুল রেখে দেয়ায় দোষ নেই। হযরত ওমর প্রমুখ সাহাবী এরূপ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এর চুল মুখ ঢেকে রাখে না এবং পানীয় বস্তুও তাকে স্পর্শ করে না।

দাড়ি ছেড়ে দেয়ার মানে লম্বা হতে দেয়া। হাদীসে বলা হয়েছে– ইহুদীরা গোঁফ লম্বা করে এবং দাড়ি কাটে। তোমরা তাদের বিপরীত কর। কোন কোন আলেম দাড়ি মুণ্ডন মাকরূহ ও বেদআত বলেছেন।

(৩) বগলের চুল। এটা চল্লিশ দিনে একবার উপড়ে ফেলা মোস্তাহাব। যেব্যক্তি শুরুতে উপড়ানোর অভ্যাস করে, তার জন্যে এটা সহজ। কিন্তু মুণ্ডন করার অভ্যাস হলে মুণ্ডনও যথেষ্ট। উদ্দেশ্য পরিষ্কার করা এবং ময়লা জমতে না দেয়া।

(৪) নাভির নীচের চুল। এগুলো লোমনাশক ব্যবহার করে অথবা উপড়ে দূর করা মোস্তাহাব। এ কাজে চল্লিশ দিনের বেশী অতিবাহিত হতে না দেয়া উচিত।

(৫) নখ কাটা। নখ বেড়ে গেলে দেখতে খারাপ দেখায় এবং তার নীচে ময়লা জমে থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আবু হোরায়রা, নখ কেটে ফেল। যে নখ বেড়ে যায় তাতে শয়তান বসে। নখের নীচে যে যৎসামান্য ময়লা থাকে। তা ওযুর বিশুদ্ধতায় প্রতিবন্ধক হয় না। কেননা, এ ময়লা পানি পৌঁছার পথে বাধা হয় না। অথবা প্রয়োজনের কারণে এ বিষয়টি সহজ করে দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নখ কাটার আদেশ দিতেন এবং ময়লাকে খারাপ বলতেন, কিন্তু কখনও নামায পুনর্বার পড়ার আদেশ দিতেন না। নখ কাটার ক্রম সম্পর্কে কোন হাদীস পাইনি। কিন্তু শুনেছি, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলি থেকে শুরু করতেন, এর পর তার ডান দিকের তিন অঙ্গুলির নখ কেটে বাঁ হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি থেকে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুলি পর্যন্ত পৌঁছতেন। এর পর সকলের শেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ কাটতেন। এ সম্পর্কে চিন্তা করার পর আমার কাছে এ রেওয়ায়েতটি সহীহ মনে হল। কেননা, এমন যুক্তিপূর্ণ বিষয় নবুওতের নূর ছাড়া জানা যায় না।

(৭) নাভি কাটা ও খতনা (লিঙ্গাগ্রের চর্মচ্ছেদন) করা। জন্মের সময় নাভি কাটা হয়। খতনা সম্পর্কে ইহুদীদের অভ্যাস হচ্ছে জন্মের সপ্তম দিনে করা। এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করা এবং সামনের দাঁত গজানো পর্যন্ত বিলম্বিত করা মোস্তাহাব। এটা বিপদাশংকা থেকেও মুক্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ খতনা করা পুরুষের জন্যে সুন্নত এবং নারীদের জন্যে ইজ্জত।

(৮) দাড়ি লম্বা হয়ে যাওয়া। এ সম্পর্কিত সুন্নত ও বেদআতসমূহ উল্লেখ করার জন্যে আমরা এটা সব শেষে বর্ণনা করছি। দাড়ি লম্বা হয়ে গেলে কি করা উচিত, এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এক মুষ্টি পরিমাণ রেখে বাকীটা কেটে ফেলায় কোন দোষ নেই। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ও অনেক তাবেয়ী এরূপ করেছেন। শা'বী ও ইবনে সিরীন (রহঃ) এটা উত্তম মনে করেছেন। কিন্তু হাসান ও কাতাদা মাকরূহ বলেছেন। তাঁরা বলেন, দাড়ি লম্বা থাকতে দেয়া মোস্তাহাব। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাড়ি লম্বা করতে বলেছেন। নখয়ী বলেন ঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তি লম্বা দাড়ি রাখলে তা ছাঁটে না কেন? এটা আমার কাছে বিস্ময়কর। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে মধ্যবর্তী স্তর ভাল। এজন্যই বলা হয়, দাড়ি লম্বা হলে বুদ্ধি লোপ পায়।

দাড়ির মধ্যে দশটি বিষয় মাকরূহ। তন্মধ্যে কয়েকটি অন্যগুলো অপেক্ষা অধিক মাকরূহ।

প্রথম, কাল রং দ্বারা দাড়ি খেজাব করা। এটা নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের যুবকদের মধ্যে তারা উত্তম যারা বৃদ্ধদের বেশ ধারণ করে এবং তোমাদের বৃদ্ধদের মধ্যে তারা অধম, যারা যুবকদের বেশ ধারণ করে। বৃদ্ধদের বেশ ধারণ করার অর্থ হচ্ছে, গাম্ভীর্য ও ভদ্রতায় বৃদ্ধের মত হবে– তাদের মত চুল সাদা করা নয়। আর যুবকদের বেশ ধারণ করার উদ্দেশ্য কাল রংয়ের খেজাব করা। হাদীসে একে দোযখীদের খেজাব বলা হয়েছে। অন্য এক রেওয়ায়েতে কাফেরদের খেজাব বলা হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তি বিয়ে করল। সে কাল খেজাব করত। চুলের গোড়া সাদা হয়ে গেলে তার বার্ধক্য বেরিয়ে পড়ে। স্ত্রীর আত্মীয়রা এ ব্যাপারে ওমর (রাঃ)-এর কাছে এ মোকদ্দমা পেশ করলে তিনি তাদের বিবাহ ভেঙ্গে দিলেন এবং স্বামীকে খুব প্রহার করে বললেন ঃ তুই বার্ধক্য গোপন করে তাদেরকে প্রতারিত করেছিস। কথিত আছে, অভিশপ্ত ফেরআউন সর্বপ্রথম কাল খেজাব করেছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ শেষ যমানায় কিছু লোক কবুতরের পুচ্ছের মত কাল খেজাব করবে। তারা জান্নাতের গন্ধও পাবে না।

দ্বিতীয়, হলুদ ও লাল রং দ্বারা খেজাব করা। এটা যুদ্ধে কাফেরদের কাছে বার্ধক্য গোপন করার উদ্দেশে জায়েয। আর যদি দ্বীনদারদের বেশ ধারণ করার নিয়তে হয়, অথচ দ্বীনদার না হয় তবে নাজায়েয। এ খেজাব সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হলদে রং মুসলমানদের খেজাব এবং লাল রং ঈমানদারদের খেজাব। আগেকার লোকেরা মেহদী দ্বারা লাল রংয়ের খেজাব করত এবং খলুক ও কতম দ্বারা হলুদ রংয়ের খেজাব করত। কোন কোন আলেম জেহাদের জন্যে কাল খেজাবও করেছেন। নিয়ত ঠিক হলে এবং খেয়াল-খুশী ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য না হলে কাল খেজাবেও কোন দোষ নেই।

তৃতীয়, গন্ধক দ্বারা চুল সাদা করা, যাতে বয়স বেশী মনে হয় এবং মানুষ সম্মান করে। বয়স বেশী হওয়া মাহাত্ম্যের পরিচায়ক বলে গণ্য হয়। অথচ আসলে এরূপ নয়। মূর্খের বয়োবৃদ্ধিতে মূর্খতাই বৃদ্ধি পায়। এলেম বৃদ্ধির ফল, যা জন্মগত, এতে বার্ধক্য কোন প্রভাব বিস্তার করে না। হযরত ওমর (রাঃ) কম বয়সী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বড় বড়

সাহাবীগণের উপর অগ্রাধিকার দিতেন এবং তাঁর কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন রাখতেন, যা অন্যদের কাছে রাখতেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ আল্লাহ তাআলা বান্দাকে যৌবনেই এলেম দান করেন এবং যৌবনের মধ্যেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। অতঃপর তিনি এই আয়াতসমূহ পাঠ করেন–

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ -

অর্থাৎ, "কাফেররা বলল ঃ আমরা এক যুবককে এই উপাস্যদের সমালোচনা করতে শুনেছি। তার নাম ইব্রাহীম।"

اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى -

অর্থাৎ, তারা কতিপয় যুবক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমি তাদের হেদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছি।

وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا -

অর্থাৎ, "আমি তাকে শৈশবে শাসনক্ষমতা দিয়েছি।"

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ওফাত পান, তখন তাঁর দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা ছিল না। লোকেরা বয়স বেশী হওয়া সত্ত্বেও এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বার্ধক্যের দোষ থেকে মুক্ত রেখেছেন। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ বার্ধক্য কি সত্যই একটি দোষ? তিনি বললেন ঃ তোমরা তো দোষই মনে কর। কথিত আছে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আকসাম একুশ বছর বয়সে কাযী তথা বিচারক নিযুক্ত হয়ে যান। এত কম বয়সের কারণে এক ব্যক্তি আদালত কক্ষেই তাঁকে কটাক্ষ করে বলল ঃ আল্লাহ কাযী সাহেবকে সাহায্য করুন, বয়স কত? ইয়াহইয়া বললেন ঃ আমি এতাব ইবনে ওসায়দের সমবয়সী, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে মক্কা মোয়াযযমার প্রশাসক ও কাযী নিযুক্ত করেছিলেন। লোকটি এ জওয়াব শুনে নিরুত্তর হয়ে গেল। ইমাম মালেক বলেন ঃ আমি কোন এক কিতাবে পাঠ করেছি– দাড়ি যেন তোমাকে ধোঁকা না দেয়। কেননা, দাড়ি পাঁঠারও থাকে। আবু আমর ইবনে আ'লা বলেন ঃ যখন তুমি কাউকে দীর্ঘদেহী, ক্ষুদ্র মাথা ও প্রশস্ত দাড়িবিশিষ্ট দেখ, তখন বুঝে নেবে সে বেওকুফ, যদিও সে উমাইয়া ইবনে আবদে শামসই হয়। আইউব

সুখতিয়ানী বলেন ঃ আমি এক বৃদ্ধকে জনৈক বালকের সামনে এলেম শিক্ষা করার জন্যে যেতে দেখেছি। হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন বলেন ঃ যেব্যক্তির কাছে তোমার পূর্বে এলেম আসে, সে সেই এলেমে তোমার ইমাম, যদিও সে বয়সে তোমার বেশ ছোট হয়। আবু আমর ইবনে আ'লাকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ বৃদ্ধ কি এটা ভাল মনে করে যে, সে বালকের কাছে এলেম শিখবে? তিনি বললেন ঃ যদি সে মূর্খতাকে খারাপ মনে করে, তবে বালকের কাছে এলেম শিক্ষা করা ভাল মনে করবে।

চতুর্থ, বার্ধক্যকে খারাপ মনে করে দাড়ির সাদা চুল উপড়ে ফেলা। হাদীসে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ শুভ্রতা মুমিনের নূর।

পঞ্চম, সমস্ত দাড়ি অথবা কিছু পরিমাণ উপড়ে ফেলা। এটা আকৃতির বিকৃতি সাধনের নামান্তর বিধায় মাকরূহ। এরূপ এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের আদালতে এলে তিনি তার সাক্ষ্য কবুল করেননি। বালক হয়ে থাকার উদ্দেশে শুরুতে দাড়ি উপড়ে ফেলা খুবই খারাপ কথা। কেননা, দাড়ি পুরুষের অলংকার। ফেরেশতারা এভাবে কসম খায়– সেই সত্তার কসম, যিনি পুরুষকে দাড়ি দ্বারা সজ্জিত করেছেন। দাড়ি সৃষ্টির পূর্ণতা, যদ্দ্বারা পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। আহনাফ ইবনে কায়েসের দাড়ি ছিল না। তাঁর শিষ্যরা বলত ঃ যদি বিশ হাজার দেরহামেও দাড়ি বিক্রয় হত, তবে আমরা অবশ্যই তাঁর জন্যে ক্রয় করতাম। দাড়ি মন্দ কিরূপে হতে পারে? এ কারণেই তো মানুষ সম্মান পায়, সম্ভ্রম লাভ করে এবং মজলিসে উচ্চ আসনে স্থান পায়। মানুষ দাড়িওয়ালাকে নামাযের জামাআতে ইমাম বানায়।

ষষ্ঠ, মহিলাদের দৃষ্টিতে সুন্দর দেখানোর জন্যে দাড়ি গোল করে কাটা। কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ শেষ যমানায় কিছু লোক তাদের দাড়ি কবুতরের পুচ্ছের মত গোল করে কাটবে এবং জুতা থেকে কাস্তের মত আওয়াজ বের করবে। ধর্মের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

সপ্তম, দাড়ির অংশ কিছু বাড়িয়ে নেয়া; অর্থাৎ, উভয় গণ্ডের উপর কান পাট্টির যে চুল থাকে এবং যা বাস্তবে মাথার চুল, তা লম্বা করে দাড়ির সাথে মিলিয়ে নেয়া এবং অর্ধেক গণ্ডদেশ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। এটা সজ্জনদের আকৃতি ও স্বভাবের খেলাফ বিধায় মাকরূহ।

অষ্টম, লোক দেখানোর জন্যে দাড়িতে চিরুনি করা। বিশর বলেন ঃ দাড়িতে দু'টি জঞ্জাল আছে– লোক দেখানোর খাতিরে চিরুনি করা এবং দরবেশী ফুটানোর জন্যে এলোমেলো রাখা।

নবম ও দশম, কাল অথবা সাদা দাড়িকে আত্মম্ভরিতার দৃষ্টিতে দেখা। এ অনিষ্ট দেহের সকল অঙ্গেই হতে পারে; বরং প্রত্যেক কর্ম ও চরিত্রে আত্মম্ভরিতা নিন্দনীয়।

তিনটি হাদীস দ্বারা জানা গেছে, শরীরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সুন্নত ঃ মাথার চুলে সিঁথি করা, কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, গোঁফ কাটা, মেসওয়াক করা, নখ কাটা, অঙ্গুলির উপর ও নীচের ভাঁজগুলো পরিষ্কার করা, বগলের চুল উপড়ানো, নাভির নীচের চুল মুণ্ডানো, খতনা করা এবং পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা। এসব বিষয় হাদীসে বর্ণিত আছে। এগুলো খুব স্মরণ রাখা উচিত।

অন্তরের যে সকল ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা ওয়াজেব, সেগুলো গণনাতীত। ইনশাআল্লাহ চতুর্থ খণ্ডে সেগুলো সবিস্তারে বর্ণিত হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

নামাযের রহস্য

জানা উচিত, নামায দ্বীন ইসলামের স্তম্ভ, বিশ্বাসের দলীল, পুণ্য কাজের মূল এবং সর্বোত্তম এবাদত। এখানে আমরা নামাযের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম ও আভ্যন্তরীণ রহস্য তথা খুশু-খুযু, এখলাস ও নিয়তের অর্থ লিপিবদ্ধ করছি, যা আধ্যাত্মিক পথের পথিকদের জন্যে জরুরী এবং যা ফেকাহ্ শাস্ত্রে সাধারণতঃ লিপিবদ্ধ করা হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আযানের ফযীলত

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তি মেশকের টিলায় অবস্থান করবে। তাদের হিসাব-নিকাশের কোন ভয় থাকবে না এবং কোনরূপ আতংক তাদেরকে স্পর্শ করবে না। হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত

হওয়া পর্যন্ত তাদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে। তাদের মধ্যে একজন সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে কোরআন তেলাওয়াত করে, নামাযে ইমামতি করে এমতাবস্থায় যে, মুসল্লীরা মসজিদে আযান দেয় এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে। তৃতীয় সে ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে দাসত্বে লিপ্ত; কিন্তু এই দাসত্ব তার আখেরাতের কাজকর্মে প্রতিবন্ধক হয় না। এক হাদীসে আছে–

لايسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شئ الا شهد له يوم القيامة -

অর্থাৎ, মুয়াযযিনের কণ্ঠস্বর যেকোন জ্বিন, মানব ও বস্তু শোনে, তারা কেয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

আরও বলা হয়েছে ঃ মুয়াযযিন যে পর্যন্ত আযান দিতে থাকে, আল্লাহ তাআলার হাত তার উপর থাকে।

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا -

অর্থাৎ, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে, তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার?

এ আয়াত সম্পর্কে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটি মুয়াযযিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن -

অর্থাৎ, "তোমরা যখন আযান শোন, তখন মুয়াযযিন যা বলে তোমরাও তা বল।"

মুয়াযযিন যা বলে তা বলা মোস্তাহাব। কিন্তু যখন সে حى على الصلوة ও حى على الفلاح (তোমরা নামাযের দিকে এস, তোমরা কল্যাণের দিকে এস) বলে, তখন শ্রোতা বলবে– لاحول ولا قوة الا بالله আর যখন সে قد قامت الصلوة (নামায শুরু হয়েছে) বলে, তখন বলবে اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ

(আল্লাহ একে কায়েম ও স্থায়ী রাখুন যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী স্থায়ী থাকে)। ফজরের আযানে যখন মুয়াযযিন বলে ঃ الصلوة خير من النوم (নামায নিদ্রা অপেক্ষা উত্তম), তখন শ্রোতা বলবে ঃ قد صدقت وبررت (তুমি সত্য বলেছ ও ভাল কাজ করেছ)। আযান শেষে এই দোয়া বলবে-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, আপনি মুহাম্মদকে ওসিলা, শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তাঁকে বেহেশতের প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করুন, যার ওয়াদা আপনি করেছেন। নিশ্চয় আপনি ওয়াদার খেলাফ করেন না।

সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জঙ্গলে নামায পড়ে, তার ডান দিকে একজন ফেরেশতা এবং বাম দিকে একজন ফেরেশতা নামায পড়ে। যদি সে আযান ও তকবীর বলে, তবে তার পেছনে পাহাড়ের মত ফেরেশতা নামায পড়ে।

নামাযের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয় নামায মুমিনদের প্রতি নির্ধারিত সময়ে ফরয করা হয়েছে।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন-

خمس صلوة كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর পাঁচটি নামায ফরয করেছেন। যেব্যক্তি এগুলো পালন করে এবং এগুলোর হককে হালকা মনে করে কিছু নষ্ট না করে, তার জন্যে আল্লাহ তাআলার অঙ্গীকার রয়েছে। তিনি তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। আর যে এগুলো আদায় করে না, তার জন্যে কোন অঙ্গীকার নেই। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তাকে আযাব দেবেন এবং ইচ্ছা করলে জান্নাতে দাখিল করবেন।"

তিনি আরও বলেন ঃ পাঞ্জেগানা নামায সুমিষ্ট পানির নদীর মত, যা তোমাদের গৃহের দরজায় অবস্থিত। যে প্রত্যহ তাতে পাঁচ বার গোসল করে, তোমরা কি মনে কর যে, পাঁচ বার গোসলের পরও তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? সকলেই আরজ করল ঃ কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বলেন ঃ পাঞ্জেগানা নামায গোনাহসমূহ এমনিভাবে দূর করে দেয়, যেমন পানি ময়লা দূর করে দেয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে-

ان الصلوة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ـ

অর্থাৎ, "কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলে পাঞ্জেগানা নামায মধ্যবর্তী সকল গোনাহ মাফ করিয়ে দেয়।"

আরও বলা হয়েছে ঃ আমাদের মধ্যে ও মোনাফেকদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, এশা ও ফজরের নামাযে হাযির হওয়া। এ দুটি নামাযে মোনাফেকরা আসতে পারে না। অন্য হাদীসে আছে, যেব্যক্তি নামায নষ্ট করে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করে, আল্লাহ তাআলা তার অন্যান্য সৎকর্মের কোন মূল্য দেবেন না। আরও বলা হয়েছে ঃ নামায দ্বীনের স্তম্ভ। যে নামায বর্জন করে সে দ্বীনকে ভূমিসাৎ করে। কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ কোন্ আমলটি উত্তম? তিনি বললেন ঃ সময়মত নামায পড়া। তিনি বললেন ঃ যেব্যক্তি পাঞ্জেগানা নামাযের হেফাযত করে, অর্থাৎ পূর্ণ ওযু দ্বারা যথাসময়ে নামায আদায় করে, নামায তার জন্যে কেয়ামতে নূর ও প্রমাণ হবে। আর যে নামায নষ্ট করে, তার

হাশর ফেরআউন ও হামানের সাথে হবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ নামায জান্নাতের চাবি। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তওহীদের পর নামাযের চেয়ে প্রিয় কোন কিছু মানুষের উপর ফরয করেননি। আল্লাহ তাআলার কাছে নামাযের চেয়ে প্রিয় অন্য কিছু থাকলে ফেরেশতাদের জন্যে সেটিই এবাদতরূপে নির্দিষ্ট করতেন। অথচ তিনি তাদের কাছে থেকে নামাযের ক্রিয়াকর্মই গ্রহণ করেন। সেমতে কেউ রুকুকারী, কেউ সেজদাকারী, কেউ দণ্ডায়মান এবং কেউ উপবিষ্ট। তিনি বলেন ঃ যেব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ছেড়ে দেয়, সে কাফের হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই, সে কুফরের কাছাকাছি চলে যায়। কারণ এতে তার তাওয়াক্কুল ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন, কেউ শহরের কাছে পৌঁছে গেলে বলা হয়, সে শহরে পৌঁছেছে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ যেব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ছেড়ে দেয়, মুহাম্মদ (সাঃ) তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যান। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি ওযু করে এবং উত্তমরূপে ওযু করে, এর পর নামাযের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয়, সে নামাযের নিয়ত করা পর্যন্ত নামাযেই থাকে। তার এক পদক্ষেপে পুণ্য লেখা হয় এবং অপর পদক্ষেপে একটি গোনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। অতএব তকবীর শুনেই তোমাদের নামাযের জন্য দৌড়ানো উচিত নয়। কেননা, বড় সওয়াব সেই পাবে, যার গৃহ দূরে থাকে। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ঃ পদক্ষেপ বেশী হওয়ার কারণে সওয়াব বেশী হবে। বর্ণিত আছে, কেয়ামতে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। এটা পূর্ণ পাওয়া গেলে অন্য সকল আমল গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে এটি অসম্পূর্ণ হলে অন্য সকল আমল নামঞ্জুর হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বললেন ঃ আবু হোরায়রা, তোমার গৃহের লোকজনকে নামায পড়ার আদেশ কর। আল্লাহ তাআলা তোমাকে ধারণাতীত স্থান থেকে রুজি দেবেন। জনৈক আলেম বলেন ঃ নামাযী সওদাগরের মত। পুঁজি না থাকলে সওদাগর মুনাফা পায় না। তেমনি নফল নামায কবুল হয় না, যে পর্যন্ত ফরয পূর্ণরূপে আদায় না করে। নামাযের সময় হলে হযরত আবু বকর (রাঃ) বলতেন ঃ দাঁড়াও, যে আগুন তুমি জ্বালিয়েছ তা নির্বাপিত কর। অর্থাৎ, নামাযকে তোমার গোনাহের কাফফারা কর।

নামাযের রোকনসমূহ পূর্ণরূপে আদায় করার ফযীলত সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ ফরয নামায নিক্তির মত। যে পুরোপুরি মেপে দেবে, সে পুরোপুরি মেপে নেবে। ইয়াযীদ রাকাশী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায মাপে সমান ছিল। অর্থাৎ, সবগুলো রোকন তিনি একই মাপে আদায় করতেন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মতের দু'ব্যক্তি নামাযের জন্যে দাঁড়ায়। তাদের রুকু-সেজদা একই; কিন্তু নামাযে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়। এ হাদীসে তিনি খুশু অর্থাৎ, বিনয় ও একাগ্রতার প্রতি ইশারা করেছেন। আরও বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন সেই বান্দার প্রতি নজর দেবেন না, যে রুকু ও সেজদার মধ্যে পিঠ সোজা করে না। এরশাদ হয়েছে ঃ যেব্যক্তি নামাযে মুখমণ্ডল ঘুরিয়ে দেয়, সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তাআলা তার মুখকে গাধার মুখে পরিণত করে দেবেন? আরও বলা হয়েছে ঃ যেব্যক্তি নামায যথাসময়ে পড়ে, তার জন্যে উত্তমরূপে ওযু করে এবং রুকু, সেজদা ও খুশু পূর্ণরূপে আদায় করে, তার নামায উজ্জ্বল হয়ে উপরে আরোহণ করে বলে ঃ আল্লাহ তোমার হেফাযত করুন যেমন তুমি আমার হেফাযত করেছ। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি নামায অসময়ে পড়ে, ওযু পূর্ণরূপে করে না এবং রুকু, সেজদা ও খুশু পূর্ণরূপে আদায় করে না, তার নামায কাল হয়ে উপরে গমন করে বলে ঃ আল্লাহ তাআলা তোমার বিনাশ করুন, যেমন তুমি আমার বিনাশ করেছ। এর পর যখন এই নামায আল্লাহ তাআলার অভিপ্রেত স্থানে পৌঁছে যায়, তখন তাকে কাপড়ের মত পুঁটলি তৈরী করে সেই ব্যক্তির মুখের উপর ছুঁড়ে মারা হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ সে ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট চোর, যে নামাযে চুরি করে। হযরত ইবনে মসঊদ ও সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন ঃ নামায একটি ওজনের নিক্তি। যে পূর্ণ দেবে সে পূর্ণ পাবে। আর যে কম দেবে সে তো জানেই, আল্লাহ তাআলা ওজনে কমদাতাদের সম্পর্কে কি বলেছেন।

জামাআতের ফযীলত সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

صلوة الجمع تفضل صلوة الفذ بسبع وعشرين درجة -

জামাআতের নামায একা নামায অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশী মর্তবা রাখে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছু লোককে কোন এক নামাযে উপস্থিত না পেয়ে বললেন ঃ আমি চাই যে, কাউকে নামায পড়ানোর আদেশ করি, এরপর নিজে সেই লোকদেরকে তালাশ করি, যারা নামাযে আসে না, এর পর তাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করি। এক রেওয়ায়েতে আছে, যারা নামাযে না এসে বসে থাকে, আমি

তাদের কাছে যেতে চাই, এর পর লাকড়ি একত্রিত করে তাদের গৃহে অগ্নিসংযোগের আদেশ দিতে চাই। তাদের কেউ যদি জানে, সে মাংসল হাড্ডি অথবা ছাগলের রান পাবে, তবে অবশ্যই এশার নামাযে আসবে।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, যেব্যক্তি এশার নামাযে হাযির হয়, সে যেন অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত নফল এবাদত করল। আর যে ফজরের নামাযে উপস্থিত হয় সে যেন পূর্ণ এক রাত্রি নফল এবাদত করল। এরশাদ হয়েছে ঃ যেব্যক্তি জামাআতে নামায পড়ে, তার বক্ষ এবাদত দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব (রঃ) বলেন ঃ বিশ বছর যাবত আমার অবস্থা এই যে, যখন মুয়াযযিন আযান দেয় তখন আমি সেজদার মধ্যেই থাকি। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' বলেন ঃ আমি দুনিয়াতে কেবল তিনটি বস্তু কামনা করি ঃ এক- ভাই, আমি বক্র হলে সে আমাকে সোজা করবে। দুই- হালাল ও অন্যের হক থেকে মুক্ত খাদ্য এবং তিন- জামাআতের নামায। বর্ণিত আছে, হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) একবার কিছু লোকের ইমাম হয়ে নামায পড়লেন। তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন ঃ এ সময় শয়তান আমার পেছনে লেগেছিল। ফলে আমি মনে করলাম, আমি অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আজ থেকে আমি আর কখনও ইমামত করব না। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি আলেমদের কাছে আসা-যাওয়া করে না, তার পেছনে নামায পড়ো না। নখয়ী বলেন ঃ যেব্যক্তি এলেম ছাড়াই ইমামত করে, সে যেন সমুদ্রের পানি পরিমাপ করে, যা কম কিংবা বেশী এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। হাতেম আসাম্ম বলেন ঃ আমি একবার জামাআতের নামায পাইনি। এজন্য কেবল আবু ইসহাক বোখারী এসে আমার কাছে শোক প্রকাশ করলেন। যদি আমার ছেলে মারা যেত, তবে দশ হাজার লোক এসে শোক প্রকাশ করত। আসলে ধর্মীয় বিপদ মানুষের কাছে দুনিয়ার বিপদের তুলনায় সহজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি আযান শুনে নামাযে হাযির হয় না, সে কল্যাণ কামনা করে না এবং তার কাছ থেকেও কোন কল্যাণ আশা করা যায় না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেনঃ কেউ আযান শুনে নামাযে না আসলে সেই ব্যক্তির কানে গালা ঢেলে দেয়া উত্তম। বর্ণিত আছে, মায়মূন ইবনে মাহরান মসজিদে এলে কেউ বলল ঃ লোকেরা নামায পড়ে চলে গেছে। তিনি বললেন ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এ জামাআতের ফযীলত আমার কাছে ইরাকের রাজত্ব লাভের তুলনায় অধিক পছন্দনীয়। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

من صلى اربعين يوما الصلوات فى جماعة لاتفوته فيها تكبيرة الاحرام كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من النار -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি চল্লিশ দিন সবগুলো নামায জামাআতের সাথে এমনভাবে পড়ে, তাতে তকবীরে তাহরীমা ফওত হয় না, তার জন্যে আল্লাহ তা'আলা দু'টি মুক্তি লেখে দেন- একটি কপটতা থেকে মুক্তি ও অপরটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

কথিত আছে, কেয়ামতের দিন কিছু লোক উত্থিত হবে, যাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল তারকার ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। ফেরেশতারা বলবে ঃ তোমরা দুনিয়াতে কি কি আমল করতে ? তারা বলবে ঃ আমরা যখন আযান শুনতাম তখন ওযুর জন্যে তৎপর হতাম। এতে অন্য কোন কাজ আমাদের প্রতিবন্ধক হত না। এর পর অন্য একটি দল উত্থিত হবে, যাদের মুখমন্ডল চন্দ্রের মত উজ্জ্বল হবে। ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসার জওয়াবে তারা বলবে ঃ আমরা সময়ের পূর্বে ওযু করতাম । এর পর কিছু লোক উত্থিত হবে, যাদের চেহারা সূর্যের মত দীপ্তিমান হবে। তারা বলবে ঃ আমরা মসজিদে বসেই আযান শুনতাম । বর্ণিত আছে, আগেকার বুযুর্গগণের প্রথম তকবীর ফওত হয়ে গেলে সাত দিন পর্যন্ত এবং জামাআত ফওত হয়ে গেলে সাত দিন পর্যন্ত নিজেদেরকে ধিক্কার দিতেন। সেজদার ফযীলত সম্পর্কে রসূলে পাক (সাঃ) বলেন ঃ

ما تقرب العبد الى الله بشئ افضل من سجود خفى -

অর্থাৎ, বান্দা নীরব সেজদার চেয়ে আল্লাহ তা'আলার উত্তম নৈকট্য অন্য কোন কিছুতে অর্জন করে না।

ما من مسلم يسجد الله سجدة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة -

অর্থাৎ, যে মুসলমান আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশে সেজদা করে,

আল্লাহ্ তা'আলা বিনিময়ে তার একটি মর্তবা বাড়িয়ে দেন এবং একটি গোনাহ্ মাফ করে দেন ।

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করুন, যাতে আমাকে আপনার শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং জান্নাতে আপনার সাহচর্য দান করেন। তিনি বলেন ঃ তুমি অধিক সেজদা করে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর। বর্ণিত আছে, সেজদার অবস্থায় বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার অধিকতর নিকটবর্তী হয়। আল্লাহ্ তা'আলার এ উক্তির উদ্দেশ্য তাই, وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ —সেজদা কর এবং নিকটবর্তী হও ।

আল্লাহ্ বলেন–

سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ

অর্থাৎ তাদের মুখমন্ডলে সেজদার চিহ্নই তাদের পরিচয়।

কারও কারও মতে এখানে 'সেজদার চিহ্ন' বলে সেই ধুলাবালি বুঝানো হয়েছে, যা সেজদা করার সময় মুখমন্ডলে লেগে যায়। কেউ কেউ বলেন ঃ সেজদার চিহ্ন হচ্ছে খুশুর নূর, যা অন্তর থেকে বাহ্যিক অঙ্গে ফুটে উঠে। এ উক্তি বিশুদ্ধতম। কেউ বলেন ঃ এর অর্থ সেই নূর, যা ওযুর চিহ্নস্বরূপ কেয়ামতে চেহারায় উদ্ভাসিত হবে। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যখন মানুষ সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করে এবং সেজদা করে, তখন শয়তান সরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, হায় বিপদ, সে সেজদার আদেশ পেয়ে সেজদা করেছে, ফলে জান্নাত পেয়েছে; আর আমি সেজদার আদেশ অমান্য করে জাহান্নাম পেয়েছি। বর্ণিত আছে, আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস প্রত্যহ এক হাজার সেজদা করতেন। এ কারণেই মানুষ তাঁকে সাজ্জাদ নামে অভিহিত করে। বর্ণিত আছে, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ মাটি ছাড়া অন্য কিছুর উপর সেজদা করতেন না। ইউসুফ ইবনে আসবাত (রঃ) বলতেন ঃ যুবক সকল, অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থতার কদর কর। আমি কেবল সেই ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা করি, যে তার রুকূ সেজদা পূর্ণরূপে আদায় করে। আমি এখন অসুস্থতার কারণে রুকূ সেজদা করতে পারি না। সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন ঃ আমি সেজদা ছাড়া দুনিয়ার কোন বস্তুর জন্যে দুঃখ করি না। ওকবা ইবনে মুসলিম (রঃ)

বলেন ঃ বান্দা আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করবে– এ ছাড়া বান্দার কোন অভ্যাস আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিকতর পছন্দনীয় নয়। সেজদার সময় ছাড়া এমন কোন সময় নেই, যাতে বান্দা আল্লাহ তা'আলার অধিক নিকটবর্তী হতে পারে। অতএব সেজদার মধ্যে অধিক দোয়া কর। নামাযের অন্যতম প্রধান বিষয় খুশুর ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ـ

অর্থাৎ, আমার স্মরণের জন্যে নামায কায়েম কর।

وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ـ

অর্থাৎ, গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়ো না, যে পর্যন্ত যা বল তা না বুঝ।

এতে কেউ কেউ মাতালের অর্থ করেছেন, দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে দিশেহারা হওয়া। কেউ বলেছেন, দুনিয়ার মহব্বতে মত্ত হওয়া। ওয়াহাব বলেছেন ঃ বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য! অর্থাৎ, মদ্যপান করে মাতাল হওয়া। মোট কথা, এতে দুনিয়ার নেশা সম্পর্কে হুশিয়ার করা হয়েছে। কেননা, বলা হয়েছে– যে পর্যন্ত তোমরা যা বল, তা না বুঝ। অনেক নামাযী এমন রয়েছে, যারা নেশার বস্তু পান করে না, কিন্তু নামাযে কি বলছে তার খবরও রাখে না। রসূলে পাক (সাঃ) বলেন ঃ

من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشئ من الدنيا غفرله ما تقدم من ذنبه ـ

অর্থাৎ, যেব্যক্তি দু'রাকআত নামায পড়ে এবং তাতে দুনিয়ার কোন কথা মনে মনে না বলে, তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মাফ করা হবে।

انما الصلوة تمسكن وتواضع وتضرع وتباؤس وتنادم

وترفع يديك فتقول اللهم فمن لم يفعل فهى خداج -

অর্থাৎ, নামায তো অসহায়তা, বিনয়, অনুনয়, দুঃখ ও অনুতাপ বৈ কিছু নয়। তুমি তোমার হাত উত্তোলন কর, এর পর বল– হে আল্লাহ, হে আল্লাহ! যে এভাবে নামায পড়ে না, তার নামায অসম্পূর্ণ।

পূর্ববর্তী কোন এক আসমানী কিতাবে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন– আমি সকল নামাযীর নামায কবুল করি না ; বরং যে আমার মাহাত্ম্যের সামনে অনুনয় করে, আমার বান্দাদের সাথে অহংকার না করে এবং আমার সন্তুষ্টির জন্যে অন্নহীনকে অন্ন দেয়, তার নামায কবুল করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ নামায, হজ্জ, তওয়াফ ও ধর্মের অন্যান্য রোকন ফরয হওয়া কেবল আল্লাহর যিকিরের জন্যে। অতএব তোমার অন্তরে যদি এই উদ্দেশ্য জাগরূক না থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও ভয়ভীতি থেকে তোমার অন্তর শূন্য থাকে, তবে তোমার যিকিরের কোন মূল্য নেই। জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

اذا صليت فصل صلوة مودع -

অর্থাৎ মনের খাহেশ, বয়স ইত্যাদিকে বিদায় করে মাওলার দিকে চল। আল্লাহ বলেন ঃ

يَآ اَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ -

অর্থাৎ, "হে মানুষ, তোমাকে আত্মরক্ষা করের তোমার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।"

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ -

অর্থাৎ, "আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, তোমরা তাঁর সাথে মিলিত হবে।"

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তিকে নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে না, সে আল্লাহর কাছ থেকে দূরেই সরে যাবে। নামায তো আল্লাহর সাথে চুপিসারে বাক্যালাপ করার নাম। অতএব এটা গাফিলতির সাথে কিরূপে হবে? বকর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ হে

মানুষ, যদি তোমার প্রভুর কাছে বিনানুমতিতে যেতে চাও এবং কোন মধ্যস্থতা ছাড়াই তাঁর সাথে কথা বলতে চাও, তবে এটা সম্ভবপর। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কিরূপে সম্ভবপর? তিনি বললেন ঃ পূর্ণ ওযু সহকারে নামাযে দাঁড়াও। এতেই বিনানুমতিতে তোমার প্রভুর সামনে চলে যাবে। এর পর মধ্যস্থতা ছাড়াই তাঁর সাথে কথা বল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সাথে কথা বলতেন এবং আমরা তাঁর সাথে কথা বলতাম, কিন্তু যখন নামাযের সময় হত, তখন তিনি যেন আমাদেরকে চিনতেন না এবং আমরা তাঁকে চিনতাম না। তিনি আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্যে এমনিভাবে মশগুল হতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لا ينظر الله الى صلوة لايحضر فيها قلبه مع بدنه -

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তাআলা এমন নামাযের দিকে তাকাবেন না, যে নামাযে মানুষ তার অন্তরকে দেহসহ উপস্থিত না রাখে।"

হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তাঁর অন্তরের অস্থির স্পন্দন দু'মাইল দূরত্বে শোনা যেত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাঁড়িয়ে অঙ্গুলি বুলাতে দেখে বললেন ঃ যদি তার অন্তরে খুশু থাকত তবে অঙ্গের মধ্যেও তা প্রকাশ পেত। বর্ণিত আছে, হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে কংকর নিয়ে খেলা করছে এবং বলছে ঃ ইলাহী, বেহেশতী হুরের সাথে আমার বিবাহ করিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার তো উপযুক্ত পাথেয় নেই। তুমি বেহেশতী হুরের সাথে বিবাহ চাও আর কংকর নিয়ে খেলা কর। খলফ ইবনে আইউবকে কেউ বলল ঃ মাছির যে দাপট! নামাযে মাছি আপনাকে বিরক্ত করে নাকি? আপনি মাছি সরিয়ে দেন না? তিনি বললেন ঃ আমি নিজেকে নামায নষ্ট করে দেয়ার মত কোন কাজে অভ্যস্ত করি না। প্রশ্নকারী বলল ঃ আপনি ধৈর্য ধরেন কিরূপে? উত্তর হল ঃ আমি শুনেছি, অপরাধী শাহী বেত্রের নীচে ধৈর্য ধরে, যাতে মানুষ তাকে ধৈর্যশীল বলে। তারা এ নিয়ে পরস্পর গর্ব করে। আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। তাঁর মাছির কারণে নড়াচড়া করতে পারি কি? মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রঃ) যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন গৃহের লোকজনকে বলতেন ঃ এখন তোমরা পরস্পর যত ইচ্ছা কথাবার্তা

বল। আমি তোমাদের কথাবার্তা শুনব না। একদিন তিনি বসরার জামে মসজিদে নামায পড়ছিলেন। ইত্যবসরে মসজিদের একটি অংশ ভূমিসাৎ হয়ে গেল। এজন্যে চতুর্দিক থেকে লোকজন এসে সেখানে জড়ো হল। কিন্তু তিনি নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই টের পেলেন না। হযরত আলী (রাঃ) নামাযের সময় হলে কাঁপতে থাকতেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত। লোকেরা জিজ্ঞেস করত ঃ আমিরুল মুমিনীন, আপনার একি অবস্থা! তিনি বলতেন ঃ সেই আমানতের সময় এসেছে, যা আল্লাহ তাআলা আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতসমূহের সামনে পেশ করেছিলেন, কিন্তু সকলেই তা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল। মানুষ তা বহন করেছে। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রঃ) যখন ওযু করতেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল ফেকাশে হয়ে যেত। তাঁর পত্নী জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওযু করার সময় আপনার একি অভ্যাস? তিনি বললেন ঃ তুমি জান না, আমি কার সামনে দাঁড়াতে চাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর মোনাজাতে বললেন ঃ ইলাহী, আপনার গৃহে (অর্থাৎ জান্নাতে) কে থাকবে? আপনি কার নামায কবুল করেন? জওয়াবে আল্লাহ তাআলা এই মর্মে ওহী পাঠালেন– হে দাউদ! যেব্যক্তি আমার মাহাত্ম্যের সামনে অনুনয় বিনয় করে, আমার স্মরণে দিন অতিবাহিত করে, আমার কারণে নিজেকে কামপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, নিরন্নকে অন্ন দেয়, মুসাফিরকে আশ্রয় দেয় এবং বিপদগ্রস্তের প্রতি দয়াপরবশ হয়, সে-ই আমার গৃহে থাকবে। আমি তারই নামায কবুল করি। তারই নূর আকাশমণ্ডলীতে সূর্যের মত ঝলমল করে। সে আমাকে ডাকলে আমি সাড়া দেই। সে যা চায় আমি তাকে তা দেই। মূর্খতাকে আমি তার জন্যে জ্ঞান করে দেই, গাফিলতিকে যিকির এবং অন্ধকারকে উজালা করে দেই। সে সর্বোপরি বেহেশত জান্নাতুল ফেরদাউসের মত, যার নদ-নদী কখনও শুষ্ক হয় না এবং ফলমূল বিস্বাদ হয় না। হাতেম আসাম্মকে কেউ তাঁর নামাযের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ নামাযের সময় হয়ে গেলে আমি পূর্ণরূপে ওযু করে নামাযের জায়গায় এসে বসি। আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির হয়ে গেলে আমি নামাযের জন্যে দাঁড়াই। কা'বা গৃহকে সম্মুখে রাখি, পুলসেরাতকে পদতলে, জান্নাতকে ডান দিকে, জাহান্নামকে বাম দিকে এবং মালাকুল মওতকে পিঠের পশ্চাতে কল্পনা করি। এর পর এ নামাযকেই সর্বশেষ নামায বলে মনে করি। অতঃপর ভয় ও আশা সহকারে দাঁড়িয়ে সশব্দে আল্লাহু আকবার বলি। উত্তমরূপে কেরাআত পড়ি। রুকু বিনয় সহকারে এবং সেজদা খুশু সহকারে আদায়

করি। বাম পা বিছিয়ে বাম নিতম্বের উপর বসি। ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি খাড়া রাখি। আমি সমগ্র নামাযে এখলাস তথা আন্তরিকতা অবলম্বন করি। এর পরও এ নামায কবুল হল কিনা, তা আমি জানি না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ চিন্তা ভাবনা সহকারে মাঝারি ধরনের দু'রাকআত নামায গাফিলতি সহকারে সারা রাত জেগে নফল পড়ার চেয়ে উত্তম।

নামাযের স্থান 'মসজিদে'র ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

অর্থাৎ, "যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে, তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহকে আবাদ করে।"

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له قصرا فى الجنة .

অর্থাৎ, যেব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মসজিদ নির্মাণ করে, যদিও তা কাতাত পক্ষীর বাসার সমান হয়, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

من الف المسجد الفه الله تعالى .

অর্থাৎ, "যেব্যক্তি মসজিদকে ভালবাসে, আল্লাহ তাআলা তাকে ভালবাসেন।"

اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس .

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন বসার পূর্বে সে যেন দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়।

আরও আছে– মসজিদের পড়শীদের নামায মসজিদে ছাড়া হয় না। আরও এরশাদ হয়েছে– যতক্ষণ নামাযী মসজিদে থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার প্রতি রহমত প্রেরণ করে। তারা বলে ইলাহী, এ ব্যক্তির প্রতি রহম করুন; ইলাহী, তার প্রতি মেহেরবানী করুন; ইলাহী তাকে ক্ষমা করে দিন। এর জন্যে শর্ত হল, ওযুহীন না হওয়া এবং মসজিদের বাইরে না যাওয়া। এক হাদীসে আছে– শেষ যমানায় আমার উম্মতের

কিছু লোক মসজিদে বৃত্তাকারে বসবে। তাদের যিকির হবে দুনিয়া ও দুনিয়ার মহব্বত। তুমি তাদের কাছে উপবেশন করো না। কেননা, এদের সাথে আল্লাহ তাআলার কোন সম্পর্ক নেই। এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা এক আসমানী কিতাবে বলেছেন ঃ পৃথিবীতে আমার গৃহ হচ্ছে মসজিসমূহ। যারা এগুলো আবাদ রাখে, তারা আমার যিয়ারত করে। সুতরাং মোবারক সেই বান্দা, যে তার গৃহ থেকে পাক সাফ হয়ে আমার গৃহে আমার যিয়ারতের জন্যে আসে। গৃহস্বামীর কর্তব্য হচ্ছে তার কাছে আগমনকারীদের সম্মান করা। আরও এরশাদ হয়েছে– তোমরা যদি কাউকে মসজিদে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে দেখ, তবে তার ঈমান সম্পর্কে সাক্ষ্য দাও। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মসজিদে বসে সে পরওয়ারদেগারের সাথে উঠাবসা করে। অতএব তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া অন্য কিছু বলা সঙ্গত নয়। কোন তাবেয়ীর উক্তি অথবা হাদীসে বর্ণিত আছে, মসজিদে কথাবার্তা বলা সৎকর্মকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন চতুষ্পদ জন্তু ঘাস খেয়ে সাবাড় করে দেয়। নখয়ী বলেন ঃ আগেকার মনীষীগণ বিশ্বাস করতেন, অন্ধকার রাতে মসজিদে যাওয়া জান্নাত লাভের কারণ। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মসজিদে বাতি জ্বালায়, বাতির আলো মসজিদে থাকা পর্যন্ত তার জন্যে আরশ বহনকারী ফেরেশতারা মাগফেরাত কামনা করে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ মরে গেলে পৃথিবীতে তার নামায পড়ার জায়গা এবং আকাশে তার আমল উঠার জায়গা তার জন্যে ক্রন্দন করে। এর সমর্থনে তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِيْنَ -

অর্থাৎ, "অতঃপর কাফেরদের জন্যে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করল না এবং তারা অবকাশপ্রাপ্ত ছিল না।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মাটি তার জন্যে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ক্রন্দন করে। আতা খোরাসানী (রঃ) বলেন ঃ মানুষ যে ভূখণ্ডে সেজদা করে, কেয়ামতের দিন সেই ভূখণ্ড সেজদার সাক্ষ্য দেবে এবং সে মারা গেলে তার জন্যে ক্রন্দন করবে। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ যে ভূখন্ডের উপর নামায অথবা মনোনিবেশ সহকারে আল্লাহ তাআলার যিকির হয়, সে ভূখণ্ড তার পার্শ্ববর্তী ভূখন্ডের উপর গর্ব করে। সে যিকিরের সুসংবাদ সপ্ত স্তর যমীনের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে দেয়। যে বান্দা দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তার জন্যে যমীন সজ্জিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম

নামাযী যখন ওযু করে, শরীর, স্থান ও বস্ত্র নাপাকী থেকে পাক করে নেয় এবং নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত বস্ত্রাবৃত করে, তখন কেবলামুখী হয়ে উভয় পায়ের মাঝখানে কিছুটা দূরত্ব রেখে দণ্ডায়মান হবে। উভয় পা পরস্পর মেলাবে না। এভাবে দণ্ডায়মান হওয়া মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে 'সকদ' ও 'সকন' করতে নিষেধ করেছেন। সকদ মানে উভয় পা মিলিয়ে দণ্ডায়মান হওয়া এবং সকন অর্থ এক পায়ে জোর রেখে অপর পা বাঁকা করে রাখা। দণ্ডায়মান অবস্থায় উভয় হাঁটু ও কোমর সোজা রাখতে হবে। মাথা সোজাও রাখা যায় এবং নতও রাখা যায়। নত রাখা বিনয়ের অধিক নিকটবর্তী। দৃষ্টি জায়নামাযের উপর রাখা উচিত। যদি জায়নামায না থাকে, তবে প্রাচীরের কাছে দাঁড়াবে অথবা নিজের চারপাশে রেখা টেনে নেবে। এতে দৃষ্টির দূরত্ব কমে যায় এবং চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয় না। যদি জায়নামাযের কিনার থেকে অথবা রেখার সীমার বাইরে দৃষ্টি চলে যায়, তবে বাধা দিতে হবে। দণ্ডায়মান হওয়ার এ অবস্থা রুকু পর্যন্ত অব্যাহত রাখা উচিত। এভাবে কেবলামুখী হয়ে দণ্ডায়মান হয়ে গেলে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে সূরা নাস পাঠ করবে। এর পর তকবীর বলবে।

যদি কোন মুক্তাদীর আগমন প্রত্যাশা করা হয়, তবে প্রথমে আযান দেবে। এরপর নিয়ত করবে। উদাহরণতঃ মনে মনে যোহরের নামাযের নিয়ত করে বলবে, আমি যোহরের ফরয আল্লাহর ওয়াস্তে আদায় করছি। এ নিয়ত তকবীরের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখবে। মনে একথা উপস্থিত করে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত এমনভাবে উঠাবে যে, উভয় হাতের তালু উভয় কাঁধের বিপরীতে এবং উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি উভয় কানের লতির বিপরীতে থাকবে। অঙ্গুলিসমূহের মাথা উভয় কানের বিপরীতে থাকবে। হাত এখানে স্থির হওয়ার পর অন্তরে নিয়ত উপস্থিত করে আল্লাহু আকবার বলবে এবং উভয় হাত নামাতে শুরু করবে। এর পর আল্লাহ আকবার পূর্ণ করে উভয় হাত নাভির উপরে এবং বুকের নীচে বাঁধবে। (এটা ইমাম

শাফেয়ী [রঃ]-এর মাযহাব)। ডান হাত উপরে ও বাম হাত নীচে থাকবে এবং ডান হাতের শাহাদত ও মধ্যের অঙ্গুলিগুলো বাম হাতের কব্জির উপর ছড়িয়ে দেবে। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের বাহু ধরে রাখবে। রেওয়ায়েতসমূহে আল্লাহু আকবার বলা হাত উঠানোর সাথেও, হাত থেমে যাওয়ার সময়ও এবং বাঁধার জন্যে নামানোর সাথেও বর্ণিত আছে। কাজেই এই তিন সময়ের যে কোন সময় আল্লাহু আকবার বলা যায়। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহু আকবার বলার পর হাত ঝুলিয়ে দিতেন। এর পর কেরাআত পড়ার ইচ্ছা করলে ডান হাত বাম হাতের উপর বেঁধে নিতেন। এ হাদীস বিশুদ্ধ হলে এ পদ্ধতি উত্তম।

এর পর শুরুর দোয়া পড়বে। আল্লাহু আকবারের সাথে এ দোয়া মিলিয়ে পড়া উত্তম—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّسُبْحٰنَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমি একনিষ্ঠ হয়ে আমার মুখমণ্ডল তাঁর দিকে করলাম, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্তে। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি এ বিষয়েই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।" (হানাফী মযহাব অনুযায়ী উক্ত দোয়াটি নিয়তের আগে পড়া হয়। শাফেয়ী মতাবলম্বী লেখক এখানে স্বীয় মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। —অনুবাদক) এরপর বলবে—

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى

جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র। আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নাম বরকতময়, আপনার স্থান উচ্চ এবং আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই।"

ইমাম এত দীর্ঘ বিরতি না দিলে মুক্তাদী এ অবস্থায় কেবল শেষোক্ত দোয়াটিই পড়ে নেবে। এর পর আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করে সূরা ফাতেহার কেরাআত শুরু করবে। সূরা ফাতেহা শেষ করে 'আমীন' শব্দটি একটু টেনে উচ্চারণ করবে। ফজর, মাগরিব ও এশার নামাযে কেরাআত সরবে পড়বে। মুক্তাদী হলে পড়বে না। এর পর একটি সূরা অথবা কমপক্ষে তিন আয়াত পরিমাণ পাঠ করবে। কেরাআতের শেষ ভাগকে রুকুর আল্লাহু আকবারের সাথে মেলাবে না। বরং সোবহানাল্লাহ্ বলার সময় পরিমাণ বিরতি দেবে। ফজরের নামাযে তিওয়ালে মুফাসসাল ও মাগরিবে কিসারে মুফাসসালের কেরাআত পড়বে। যোহর, আছর ও এশার নামাযে وَالسَّمَاۤءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ও তার মত অন্যান্য সূরা পাঠ করবে। সফর অবস্থায় ফজরের নামাযে সূরা কাফিরূন ও সূরা এখলাস পড়বে। ফজরের সুন্নতেও তাই পড়বে। কেরাআত শেষে রুকু করবে, এর জন্যে আল্লাহু আকবার বলবে। তকবীর এতটুকু টেনে পড়বে যেন রুকুতে পৌছার পর শেষ হয়। রকুতে উভয় হাতের তালু হাঁটুর উপর রাখবে এবং অঙ্গুলিসমূহ ছড়িয়ে গোছার দিকে কেবলামুখী রাখবে। এ সময় মাথা, ঘাড় ও পিঠ সমতল থাকবে। উভয় কনুই পার্শ্ব থেকে আলাদা থাকবে। স্ত্রীলোক কনুই পার্শ্বের সাথে মিলিয়ে রাখবে।

রুকুতে তিন বার সোবহানা রাব্বিয়াল আযীম বলবে। ইমাম না হলে তিনের অধিক সাত ও দশ বার পর্যন্ত বলা উত্তম। এর পর রুকু থেকে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলতে বলতে সোজা হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়াবে এবং বলবে—

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْاَ الْاَرْضِ وَمِلْاَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ ـ

এর পর তকবীর বলতে বলতে সেজদার জন্যে নত হবে। প্রথমে

হাঁটু মাটিতে রাখবে, এর পর খোলা অবস্থায় হাতের তালু ও কপাল মাটিতে রাখবে এবং সকলের শেষে নাকের ডগা রাখবে। এ সময় কনুই পার্শ্ব থেকে আলাদা রাখবে এবং স্ত্রীলোক হলে মিলিয়ে রাখবে। সেজদায় পেট উরু থেকে আলাদা রাখবে এবং উভয় উরু পৃথক রাখবে। স্ত্রীলোক পেট উরুর সাথে এবং উভয় উরু পরস্পরে মিলিয়ে রাখবে। হাত মাটিতে কুকুরের ন্যায় বিছিয়ে রাখবে না; বরং কনুই উপর রাখবে। কনুই মাটিতে লাগানো নিষিদ্ধ। সেজদায় তিন বার সোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা বলবে। আরও বেশী বার বলা উত্তম। ইমাম হলে তিন বারের বেশী বলা অনুচিত। এর পর তকবীর বলতে বলতে সেজদা থেকে মাথা তুলে স্থিরভাবে বসে যাবে। বাম পায়ের উপর বসে ডান পা খাড়া রাখবে এবং উরুর উপর উভয় হাতের অঙ্গুলিসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা রাখবে। এরপর প্রথম সেজদার ন্যায় দ্বিতীয় সেজদা করবে এবং আল্লাহু আকবার বলতে বলতে উঠে দাঁড়াবে। দ্বিতীয় রাকআতও প্রথম রাকআতের মতই পড়বে। দ্বিতীয় রাকআত সেজদাসহ শেষ করার পর বসা অবস্থায় তাশাহ্হুদ পড়বে। তাশাহ্হুদ পড়ার সময় দু'সেজদার মাঝখানে যেভাবে বসেছিলে, সেভাবে বসবে। অর্থাৎ, ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসবে এবং ডান হাত ডান উরুর উপর ও বাম হাত বাম উরুর উপর রাখবে। তাশাহ্হুদের মধ্যে 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে এবং অন্য অঙ্গুলিগুলো বন্ধ করে নেবে। শেষ তাশাহহুদের মধ্যে দরূদের পর দোয়া মাসূরা পাঠ করবে। এরপর ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ মুখ এতটুকু ফেরাবে যেন পেছনের মুসল্লী তার ডান গাল দেখতে পায়। এর পর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে একইভাবে সালাম বলবে। প্রথম সালামে ডান দিকের ফেরেশতা ও মুসল্লীদের নিয়ত করবে। তেমনি দ্বিতীয় সালামে বাম দিকের ফেরেশতা ও মুসল্লীদের নিয়ত করবে। ইমাম হলে নামাযের সকল তকবীর সরবে বলবে। ইমাম ইমামতির নিয়ত করবে। এতে সওয়াব হবে। যদি ইমামতির নিয়ত না করে নামায পড়ে নেয়, মুক্তাদীর নামায দুরস্ত হবে এবং জামাআতের সওয়াব সকলেই পাবে। ইমাম নামাযের দোয়া, আঊযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ নীরবে পড়বে। ফজরের দু'রাকআতে এবং মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাকআতে ইমাম

আলহামদু ও অন্য সূরা সরবে পাঠ করবে। পরবর্তী রাকআতসমূহে কেবল আলহামদু পড়বে এবং নীরবে পড়বে। সালামের পর ইমাম বুকের বিপরীতে দুই হাত তুলে দোয়া করবে এবং দোয়ার পর মুখমণ্ডলের উপর হাত বুলিয়ে নেবে।

নামাযের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে যেসব বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলো এই ঃ নামাযে করজোড়ে দণ্ডায়মান হওয়া এক পায়ে জোর দিয়ে অপর পা ঘোড়ার মত বাঁকা করে রাখা। কুকুরের মত বসা; অর্থাৎ, নিতম্বে বসে উভয় হাঁটু খাড়া করে উভয় হাত মাটিতে রেখে দেয়া। এমনভাবে চাদর ইত্যাদি জড়িয়ে নামায পড়া যেন হাত ভেতরেই থাকে এবং রুকু সেজদায়ও হাত বাইরে না আনা। ইহুদীরা এরূপ করত, তাই তাদের মত করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকু সেজদা করার সময় হাত কোর্তা ইত্যাদিতেও হাত ভেতরে রাখা উচিত নয়। সেজদা করার সময় পরিধেয় বস্ত্র পেছনে অথবা সামনে দিয়ে তুলে নেয়া। ইমাম আহমদ কোর্তার উপর লুঙ্গি বেঁধে নামায পড়া মাকরূহ বলেছেন। কোমরে হাত রাখা, দাঁড়ানো অবস্থায় বাহু শরীর থেকে আলাদা রেখে কোমরে হাত রাখা, ইমামের জন্যে আল্লাহু আকবার বলার সাথে সাথেই কেরাআত শুরু করে দেয়া এবং কেরাআত খতম হতেই রুকুর তকবীর বলা, মুক্তাদীর জন্যে নিজের শুরুর তকবীরকে ইমামের তকবীরের সাথে এবং সালামকে ইমামের সালামের সাথে মিলিয়ে দেয়া, এছাড়া প্রথম সালামকে দ্বিতীয় সালামের সাথে মিলিয়ে দেয়া ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্যে নিষিদ্ধ। উভয় সালাম আলাদাভাবে বলতে হবে। প্রস্রাব অথবা পায়খানার চাপ নিয়ে নামাযে পড়া, মোজা পরিধান করে নামায পড়া– এগুলো খুশুর পরিপন্থী। তেমনি ক্ষুধা-পিপাসা নিয়ে নামায পড়াও মাকরূহ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ রাতের খানা এসে গেলে এবং নামাযের তকবীর হলে আগে খানা খেয়ে নাও; কিন্তু নামাযের সময় সংকীর্ণ হলে অথবা মন স্থির থাকলে আগেই নামায পড়বে। অন্য এক হদীসে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ যে নামাযে মন উপস্থিত না থাকে, সেই নামায দ্রুত আযাবের দিকে নিয়ে যায়। এক হাদীসে আছে– নামাযের মধ্যে সাতটি কাজ শয়তানের পক্ষ থেকে হয়–

নাক দিয়ে রক্ত আসা, নিন্দা, কুমন্ত্রণা, হাই তোলা, চুলকানো, এদিক ওদিক দেখা এবং কোন কিছু নিয়ে খেলা করা। কেউ কেউ ভুল সন্দেহকেও এর সাথে যোগ করেছেন। জনৈক মনীষী বলেন ঃ নামাযের মধ্যে চারটি কাজ অন্যায়– এদিক ওদিক তাকানো, মুখ মোছা, কংকর সমান করা এবং মানুষের চলার পথ সামনে রেখে নামায পড়া।

অঙ্গুলিসমূহকে পরস্পরের ফাঁকে ঢুকানো এবং অঙ্গুলি ফুটানো, মুখ আবৃত করা, রুকুতে হাতের এক তালু অপর তালুর সাথে মিলিয়ে উভয় হাঁটুর মাঝখানে রাখাও এর অন্তর্ভুক্ত। জনৈক সাহাবী বলেন ঃ আমরা প্রথমে এরূপ করতাম; এরপর এটা নিষিদ্ধ হয়েছে। সেজদা করার সময় মাটিতে ফুঁক দেয়া অথবা হাতে কংকর সমান করা। কেননা, নামাযে এসব কর্মের প্রয়োজন নেই। দাঁড়ানো অবস্থায় প্রাচীরে হেলান দেয়া, যদি এমনভাবে হেলান দেয় যে, হেলানের বস্তু সরিয়ে নিলে সে নির্ঘাত পড়ে যাবে, তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

নামাযের ফরয ও সুন্নত

উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে ফরয, সুন্নত, মোস্তাহাব ও উত্তম সবই রয়েছে। আধ্যাত্ম পথের পথিক যাতে সবগুলো পালন করে, এজন্যে সবগুলো একত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখন আমরা সবগুলো আলাদা আলাদা বলে দিচ্ছি। উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে বারটি বিষয় ফরয ঃ (১) নিয়ত করা, (২) তকবীর বলা, (৩) দণ্ডায়মান হওয়া, (৪) সূরা ফাতেহা পাঠ করা, (৫) হাতের তালু হাঁটুতে স্থিরভাবে রেখে রুকু করা, (৬) রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, (৭) স্থিরভাবে সেজদা করা, এতে হাত মাটিতে রাখা ওয়াজেব নয়, (৮) সেজদা থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসা, (৯) দ্বিতীয় বৈঠক করা, (১০) শেষ তাশাহ্হুদ পড়া, (১১) শেষ তাশাহ্হুদে দুরূদ পাঠ করা এবং (১২) প্রথম সালাম ফেরানো। এই বারটি ছাড়া অবশিষ্টগুলো ওয়াজেব নয়; বরং সুন্নত ও মোস্তাহাব।

ফরয ও সুন্নতের পার্থক্য হল, যে কাজ না করলে নামায দুরস্ত হয় না তা ফরয এবং যে কাজ না করলেও নামায শুদ্ধ হয়, তা সুন্নত। অথবা ফরয কাজ ছেড়ে দিলে শাস্তি হয় এবং সুন্নত কাজ ছেড়ে দিলে শাস্তি হয় না। এভাবে ফরয ও সুন্নতের পার্থক্য বুঝা যায়। এখন প্রশ্ন হয়, সুন্নত ও

মোস্তাহাব তরক করলে শাস্তি হয় না এবং পালন করলে সওয়াব হয়, এমতাবস্থায় পার্থক্য কি হল? এর জওয়াব এই, সওয়াব, শাস্তি ও হওয়ার ব্যাপারে সকল সুন্নতই অভিন্ন। এতে করে সুন্নত মোস্তাহাবের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না। এগুলোর পার্থক্যের বিষয়টি আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলছি। উদাহরণ এই ঃ মানুষকে দু'টি কারণেই বিদ্যমান ও পূর্ণাঙ্গ বলা হয়– আভ্যন্তরীণ বিষয় ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কারণে। আভ্যন্তরীণ বিষয় হচ্ছে জীবন ও আত্মা। আর বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো সকলেরই জানা। এসব অঙ্গের কতক এমন, এগুলো না হলে মানুষ মানুষ থাকে না; যেমন অন্তর, কলিজা ও মস্তিষ্ক ইত্যাদি। এগুলো না থাকলে মানুষের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে যায়। কতক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন, এগুলো না থাকলে জীবন তো বিনষ্ট হয় না; কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য ফওত হয়ে যায়। যেমন– চক্ষু, হাত, পা, জিহ্বা। কতক অঙ্গ এমন, এগুলো না থাকলে জীবনও বিনষ্ট হয় না এবং জীবনের উদ্দেশ্যও ফওত হয় না; কিন্তু সৌন্দর্য অবশিষ্ট থাকে না। যেমন– ভ্রূ, দাড়ি, চোখের পলক এবং সুন্দর বর্ণ। কতক অঙ্গ এমন, যেগুলো না থাকলে আসল সৌন্দর্য বিনষ্ট হয় না; যেমন ভ্রূ বক্র হওয়া, দাড়ি ও পলক কৃষ্ণ বর্ণ হওয়া, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুডৌল হওয়া এবং গৌরবর্ণ হওয়া। এমনিভাবে নামায এবাদত ও শরীয়ত নির্মিত একটি আকৃতি। এ আকৃতি অর্জন করা আমাদের জন্যে এবাদত নির্ধারিত হয়েছে। এ আকৃতির আত্মা ও জীবন তথা আভ্যন্তরীণ বিষয় হচ্ছে খুশু, নিয়ত, মনের উপস্থিতি ও এখলাস। এর বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হচ্ছে রুকু, সেজদা, দাঁড়ানো ও অন্যান্য ফরয কর্ম। এগুলো মানুষের অন্তর, কলিজা ও মস্তিষ্কের অনুরূপ। এগুলো না হলে নামায হয় না। আর যে যে কাজ সুন্নত; যেমন শুরুর দোয়া ও প্রথম তাশাহ্হুদ, সেগুলো হাত, পা ও চক্ষুর অনুরূপ। এগুলো না হলে নামাযের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় না; যেমন– হাত, পা ও চক্ষু না থাকলে জীবন বিনষ্ট হয় না, বরং মানুষ কুশ্রী হয়ে যায় এবং সকলেই তাকে হেয় দৃষ্টিতে দেখে। অনুরূপভাবে যেব্যক্তি নামাযে কেবল ততটুকু কাজ করে, যতটুকু দ্বারা নামায দুরস্ত হয়ে যায় এবং সুন্নত পালন করে না, সে সেই ব্যক্তির মত, যে কোন বাদশাহের কাছে এমন এক গোলাম উপঢৌকন পাঠায়, যে জীবিত; কিন্তু হাত পা কর্তিত। নামাযে যেসব কাজ মোস্তাহাব, সেগুলোর

মর্তবা সুন্নতের চেয়ে কম। এগুলো সৌন্দর্যের জরুরী বিষয়রূপে পরিগণিত; যেমন যিকির ইত্যাদি- এগুলো সৌন্দর্যের পরিপূরক বিষয়বস্তু; যেমন ভ্রূ বক্র হওয়া, দাড়ি গোলাকার হওয়া ইত্যাদি।

সারকথা, নামায মানুষের কাছে একটি নৈকট্যের উপায় ও উপঢৌকন, যদ্দারা সে সত্যিকার শাহানশাহের দরবারে নৈকট্য কামনা করে; যেমন কোন ব্যক্তি দুনিয়ার বাদশাহের নৈকট্য লাভের জন্যে তার দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ করে। মানুষের এই উপঢৌকন প্রতাপশালী আল্লাহর দরবারে পেশ হয়ে বিচারের দিন আবার তার কাছে ফিরে আসবে। এখন মানুষ ইচ্ছা করলে এ উপঢৌকনের আকার আকৃতি সর্বাঙ্গ সুন্দর করুক এবং ইচ্ছা করলে বিশ্রী করুক। সর্বাঙ্গ সুন্দর করলে তারই উপকার এবং বিশ্রী করলে তারই অপকার হবে। মানুষ যদি ফেকাহ্শাস্ত্রে পারদর্শিতার সুবাদে ফরয ও সুন্নতের এই পার্থক্য বুঝে নেয়, সুন্নত তাকে বলে যা না করা জায়েয এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সুন্নত ছেড়ে দেয়, তবে সে সেই চিকিৎসকের মত হবে যে বলে, চক্ষু বিনষ্ট করে দিলেও মানুষের অস্তিত্ব টিকে থাকে। বলাবাহুল্য, চক্ষুবিহীন গোলাম বাদশাহের কাছে উপঢৌকন পেশ করে তার নৈকট্য প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং যেব্যক্তি নামাযের রুকু সেজদা পূর্ণ করে না, এ নামাযই হবে তার প্রথম দুশমন। নামায বলবে, পরওয়ারদেগার তোমাকে বরবাদ করুন, যেমন তুমি আমাকে বরবাদ করেছিলে।
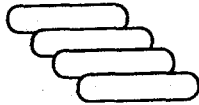
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত নামাযের আভ্যন্তরীণ শর্ত

নামাযে খুশু ও অন্তরের উপস্থিতি শর্ত। এর প্রমাণ অনেক। আল্লাহ বলেন ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ -

অর্থাৎ, আমার স্মরণের জন্যে নামায কায়েম কর।

এ থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায়, নামাযে অন্তরের উপস্থিতি ওয়াজেব। নামাযে গাফেল থাকা স্মরণের বিপরীত। অতএব যেব্যক্তি সমগ্র নামাযে গাফেল থাকে, সে আল্লাহর স্মরণের জন্যে নামায কায়েমকারী কিরূপে হবে?

وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ -

অর্থাৎ, গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

এখানে নিষেধ পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে, যদ্দারা বুঝা যায়, গাফেল হওয়া হারাম।

حَتّٰى تَعْلَمُوْنَ مَا تَقُوْلُوْنَ -

অর্থাৎ, যে পর্যন্ত যা বল, তা না বুঝ।

এতে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকেও নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে। এ কারণ সেই ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যে গাফেল, কুমন্ত্রণায় মগ্ন এবং পার্থিব চিন্তা-ভাবনার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

নামায তো অসহায়ত্ব ও অনুনয় বৈ কিছুই নয়। হাদীসের শব্দাবলী থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, সেটাই নামায, যার মধ্যে অসহায়ত্ব ও অনুনয়-বিনয় থাকে। এক হাদীসে আছে, যেব্যক্তির নামায তাকে মন্দ ও অশ্লীল কর্ম থেকে বিরত রাখে না, সেই নামায তার মধ্যে ও আল্লাহ তাআলার মধ্যে দূরত্বই বৃদ্ধি করে। বলাবাহুল্য, গাফেল ব্যক্তির নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজের পথে অন্তরায় নয়। এরশাদ হয়েছে- অনেক নামাযী

এমন, তাদের নামায থেকে তারা কেবল কষ্ট ও শ্রমের অংশই পায়। এতে গাফেল ছাড়া অন্য কোন নামাযী উদ্দেশ্য নয়। আরও বলা হয়েছে– বান্দা তার নামাযের ততটুকুই পাবে, যতটুকু সে বুঝে।

এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত বক্তব্য, নামাযী তার পরওয়ারদেগারের সাথে মোনাজাত (কানাকানি) করে। হাদীসে এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। গাফিলতি সহকারে যে কথা বলা হয়, তা নিশ্চিতই মোনাজাত হবে না। যাকাত, রোযা ও হজ্জ এমন ফরয কর্ম, যেগুলো গাফিলতি সহকারে আদায় করলেও আসল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়। যাকাত প্রদান স্বয়ং মানুষের ধনলিপ্সার বিপরীত এবং মনের জন্যে কঠিন কাজ। এমনিভাবে রোযা মানুষের পাশবিক শক্তিকে দাবিয়ে রাখে এবং যে খাহেশ দুশমন ইবলীসের হাতিয়ার, সেই খাহেশ ভেঙ্গে চুরমার করে। হজ্জও তেমনি কষ্টকর ও কঠিন কাজ। এতে এত পরিশ্রম আছে যদ্দ্বারা পরীক্ষা অর্জিত হয়ে যায়– সম্পাদনের সময় অন্তর উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু নামাযে যিকির, কেরাআত, রুকু, সেজদা, দণ্ডায়মান হওয়া ও বসা ছাড়া কিছুই নেই। এখন দেখতে হবে, যিকিরের উদ্দেশ্য সম্বোধন ও বাক্যালাপ করা, না কেবল মুখে অক্ষর ও স্বর উচ্চারণ করা, শেষোক্ত বিষয়টি যিকিরের উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা, গাফেল ব্যক্তির জন্যে প্রলাপ বকার সময় জিহ্বা নাড়াচাড়া করা মোটেই কঠিন নয়। এরূপ যিকির পরীক্ষা হতে পারে না। বরং যিকিরের উদ্দেশ্য হবে মনের ভাব প্রকাশ করে বাক্যালাপ করা। এটা অন্তর উপস্থিত না করে অর্জিত হতে পারে না। উদাহরণতঃ মনকে গাফেল রেখে মুখে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ উচ্চারণ করলে একে কেউ প্রার্থনা বলবে না। সুতরাং যিকির দ্বারা অনুনয়-বিনয় ও দোয়া উদ্দেশ্য না হলে গাফিলতির সাথে জিহ্বা নাড়াচাড়া করা কঠিন হবে কি? অভ্যাস হয়ে যাওয়ার পর এটা মোটেই কঠিন কাজ নয়। এরূপ ব্যক্তি নামাযের আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ অন্তর স্বচ্ছ হওয়া ও ঈমানের বন্ধন সুদৃঢ় হওয়া থেকে অনেক দূরে থাকবে। এটা হল কেরাআত ও যিকির সম্পর্কে কথা। এখন রুকু ও সেজদার উদ্দেশ্য তাযীম তথা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন। মানুষ যদি তার কাজ দ্বারা আল্লাহ থেকে গাফিল হয়ে আল্লাহর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারে, তবে সে তার কাজ দ্বারা গাফেল অবস্থায় সম্মুখে রক্ষিত কোন

মূর্তির প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে এবং এটা বিশুদ্ধ হবে। রুকু ও সেজদা যখন ভক্তি প্রদর্শন থেকে শূন্য হবে, তখন থেকে যাবে কেবল পিঠ ও মাথার নাড়াচাড়া। এটা এতটুকু কঠিন কাজ নয়, এর দ্বারা বান্দার পরীক্ষা উদ্দেশ্য হতে পারে অথবা একে ধর্মের স্তম্ভ করা যেতে পারে, কুফুর ও ইসলামের পার্থক্য সাব্যস্ত করা যেতে পারে এবং হজ্জ ও অন্যান্য সকল এবাদতের অগ্রে স্থান দেয়া যেতে পারে। নামাযের এই মাহাত্ম্য কেবল তার বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের কারণে, এটা আমাদের বোধগম্য নয়। হাঁ, মোনাজাত তথা আল্লাহর সাথে সংগোপনে কথা বলার উদ্দেশ্য যোগ হলে নামায রোযা, হজ্জ এবং যাকাত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবাদত হয়ে যায়; বরং কোরবানীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে নামায। আর্থিক ক্ষতি স্বীকারের মাধ্যমে নফলের মোজাহাদা করার জন্যে আল্লাহ তাআলা কোরবানীর বিধান দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কে বলেছেন–

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ -

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে এসব জন্তুর মাংস ও রক্ত পৌছে না; কিন্তু তোমাদের তাক্ওয়া তাঁর কাছে পৌছে।

এখানে তাকওয়া অর্থ এমন গুণ, যা অন্তরের উপর প্রবল হয়ে আদেশ পালনের কারণ হয়। কোরবানীতে এটাই উদ্দেশ্য। সুতরাং এটা নামাযের উদ্দেশ্য হবে না কিরূপে?

মোট কথা, উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ একথা জ্ঞাপন করে যে, নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্যে অন্তরের উপস্থিতি শর্ত। কিন্তু ফেকাহ্বিদগণ বলেন, কেবল আল্লাহু আকবার বলার সময় অন্তরের উপস্থিতি শর্ত। অতএব আমার উপস্থাপিত বক্তব্য নিঃসন্দেহে তাঁদের বিপরীত। এর জওয়াব এই, ফেকাহবিদগণ মানুষের বাতেন তথা অন্তর সম্পর্কে কোন আলোচনা করেন না এবং তাঁরা অন্তর চিরে আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানার চেষ্টাও করেন না; বরং তাঁরা ধর্মের বাহ্যিক বিধানাবলীকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক কর্মের উপর ভিত্তিশীল করেন। তাঁদের মতে, বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মই জাগতিক শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট। এখন এই বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম আখেরাতে গ্রহণযোগ্য ও উপকারী হবে কি-না, এ আলোচনা ফেকাহর গণ্ডির বাইরে।

এছাড়া অন্তরের উপস্থিতি ছাড়া আমল পূর্ণ হওয়ার উপর কোন ইজমা দাবী করা যায় না। সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি খুশু সহকারে নামায পড়ে না, তার নামায ফাসেদ। এক রেওয়ায়েতে হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, যে নামাযে অন্তর উপস্থিত নয়, সেই নামায দ্রুত আযাবের দিকে নিয়ে যায়। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, যেব্যক্তি নামাযে থেকে ইচ্ছাপূর্বক ডান ও বামের ব্যক্তিকে চিনতে পারে, তার নামায হবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বান্দা নামায পড়ে অথচ তা থেকে তার জন্যে ছয় ভাগের এক ও দশ ভাগের এক অংশও লিখিত হয় না। কেবল ততটুকুই লেখা হয়, যতটুকু সে বুঝে শুনে পড়ে। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন ঃ আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, বান্দা তার নামাযের ততটুকু অংশই পায় যতটুকু সে অন্তরে উপস্থিত রেখে পড়ে। তিনি তো অন্তরের উপস্থিতির উপর ইজমাই দাবী করলেন। পরহেযগার ফেকাহবিদ ও আখেরাতের আলেমগণের পক্ষ থেকে এ ধরনের অসংখ্য উক্তি বর্ণিত আছে। সত্য এই, শরীয়তের প্রমাণাদি দেখা উচিত। হাদীস ও মনীষীবর্গের উক্তি থেকে বাহ্যতঃ এটাই বুঝা যায় যে, অন্তরের উপস্থিতি শর্ত। কিন্তু বাহ্যিক বিধানাবলীতে ফতোয়ার স্থান মানুষের ধারণা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। এদিক দিয়ে মানুষের জন্যে সমগ্র নামাযে অন্তর উপস্থিত রাখা শর্ত করে দেয়া সম্ভবপর নয়। কেননা, এটা করতে স্বল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সকলেই অক্ষম। সমগ্র নামাযে শর্ত করা যখন সম্ভবপর হল না, তখন বাধ্য হয়েই এমনভাবে শর্ত করতে হল যে, একটি মুহূর্তে যেন অন্তর উপস্থিত থাকে। নামাযের অন্য সব মুহূর্তের তুলনায় আল্লাহু আকবার বলার মুহূর্তটি এ শর্তের জন্যে অধিক উপযুক্ত। তাই ফতোয়ায় কেবল এ মুহূর্তটিই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমরা আশাবাদী, যেব্যক্তি সমগ্র নামাযে গাফেল থাকে, তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত খারাপ হবে না, যে নামাযই পড়ে না। কেননা, গাফেল তো বাহ্যতঃ কিছু কর্মের উদ্যোগ নিয়েছে এবং অন্তরকে এক মুহূর্ত হলেও উপস্থিত করেছে। যেব্যক্তি ভুলবশতঃ ওযু ছাড়া নামায পড়ে নেয়, তার নামায আল্লাহ তাআলার কাছে বাতিল। কিন্তু তার কাজ ও ওযর অনুযায়ী কিছু সওয়াব সে পাবে। এতদসত্ত্বেও ফেকাহবিদগণ গাফিলতি সহকারে নামায দুরস্ত হওয়ার যে ফতোয়া দেন, তাদের বিরুদ্ধে আমরা কোন ফতোয়া দিতে পারি না। কেননা, এ ফতোয়া মুফতীকে

বাধ্য হয়েই দিতে হয়; যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন নামাযের রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তির জানা উচিত, গাফিলতি নামাযের জন্যে ক্ষতিকর।

সারকথা, অন্তরের উপস্থিতি নামাযের প্রাণ। এ প্রাণ অবশিষ্ট থাকার সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে আল্লাহু আকবার বলার সময় অন্তর উপস্থিত থাকা। এর যতবেশী অন্তর উপস্থিত থাকবে, ততই নামাযের অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ সঞ্চারিত হবে। যে জীবিত ব্যক্তির নড়াচাড়া নেই, সে মৃতের কাছাকাছি। সুতরাং যেব্যক্তি সমগ্র নামাযে গাফেল থেকে কেবল আল্লাহু আকবার বলার সময় অন্তর উপস্থিত রাখে, তার নামায ঐ জীবিত ব্যক্তির মত, যার নড়াচাড়া নেই। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি– তিনি যেন গাফিলতি দূর করা এবং অন্তরের উপস্থিতি অর্জনের ব্যাপারে আমাদেরকে উত্তমরূপে সাহায্য করেন।

যেসব আভ্যন্তরীণ বিষয় দ্বারা নামাযের জীবন পূর্ণাঙ্গ হয়

প্রকাশ থাকে যে, এসব বিষয় বুঝানোর জন্যে অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ছয়টি শব্দ সবগুলো বিষয় একত্রে সন্নিবেশিত করে। এখন কারণ ও প্রতিকারসহ এসব শব্দের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম শব্দ হচ্ছে হুযুরে দিল (অন্তরের উপস্থিতি)। এর উদ্দেশ্য, মানুষ যে কাজ করছে এবং যে কথা বলছে, সেটি ছাড়া অন্যান্য কাজ ও কথা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা। অর্থাৎ, অন্তর কাজ ও কথা উভয়টি জানবে এবং এ দুটি ছাড়া অন্য কিছুতে তার চিন্তা ঘুরাফেরা করবে না। মানুষ যে কাজে লিপ্ত, তার চিন্তা যখন সেই কাজ ছাড়া অন্য দিকে না যায় এবং স্মৃতিতে সেই কাজই জাগরূক থাকে, তখন তার অন্তরের উপস্থিতি অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় শব্দ ফাহম অর্থাৎ কালামের অর্থ বুঝা। এটা অন্তরের উপস্থিতি থেকে ভিন্ন। কেননা, প্রায়ই অন্তর শব্দের সাথে উপস্থিত থাকে এবং অর্থের সাথে উপস্থিত থাকে না। ফাহমের উদ্দেশ্য অন্তরে শব্দের অর্থ জানা। এক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কোরআনের অর্থ ও তসবীহ্ বুঝার ব্যাপারে সকলেই একরূপ নয়। অনেক সূক্ষ্ম অর্থ নামাযী ঠিক নামাযের মধ্যেই বুঝে নেয়, অথচ পূর্বে তার অন্তরে এ অর্থ কখনও ছিল না। এ কারণেই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ করতে বারণ করে।

অর্থাৎ এমন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করায়, যা মন্দ কাজে প্রতিবন্ধক হয়।

তৃতীয় শব্দ তাযীম (ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন)। এটা অন্তরের উপস্থিতি ও ফাহম থেকে ভিন্ন। কেননা, মানুষ তার গোলামের সাথে কথা বলে, অন্তরও হাযির থাকে এবং নিজের কথার অর্থও বুঝে; কিন্তু গোলামের তাযীম করে না। এ থেকে জানা গেল, তাযীম হুযুরে দিল ও ফাহমের উর্ধ্বে।

চতুর্থ শব্দ 'হয়বত' অর্থাৎ ভয়। এটা তাযীমেরও উর্ধ্বে। বরং হয়বত সেই ভয়কে বলে, যা তাযীম থেকে উদ্ভূত হয়। বিচ্ছু, গোলামের অসচ্চরিত্রতা ইত্যাকার সামান্য জিনিসের ভয়কে হয়বত বলে না; বরং প্রতাপশালী বাদশাহকে ভয় করার নাম হয়বত।

পঞ্চম শব্দ রাজা অর্থাৎ আশা। এটাও পূর্ববর্তী সবগুলো থেকে ভিন্ন। অনেক মানুষ কোন বাদশাহের তাযীম করে। তার প্রতাপকে ভয় করে; কিন্তু তার কাছে কোন কিছু আশা করে না। বান্দার উচিত নামায দ্বারা আল্লাহ তাআলার সওয়াব আশা করা।

ষষ্ঠ শব্দ হায়া অর্থাৎ লজ্জা-শরম। এটা পূর্ববর্তী পাঁচটি থেকে আলাদা। কেননা, এর উৎপত্তি নিজের ভুল ত্রুটি উপলব্ধি করা থেকে। অতএব তাযীম, ভয় ও আশা এমন হতে পারে, যাতে হায়া নেই। অর্থাৎ, ত্রুটির ধারণা ও গোনাহের কল্পনা না থাকলে হায়া হবে না।

মোট কথা, উপরোক্ত ছয়টি বিষয় দ্বারা নামাযের প্রাণ পূর্ণাঙ্গ হয়। এখন এগুলোর কারণ আলাদা আলাদা বর্ণিত হচ্ছে।

মনের উপস্থিতির কারণ হিম্মত তথা চিন্তা-ফিকির। মানুষের মন তার হিম্মতের অনুকরণ করে। যে বিষয় মানুষকে চিন্তান্বিত করে দেয় তাতেই তার অন্তর উপস্থিত থাকে। চিন্তার কাজে অন্তর উপস্থিত থাকাই মানুষের মজ্জা। নামাযে অন্তর উপস্থিত না হলে অন্তর বেকার থাকবে না; বরং যে পার্থিব বিষয়ে চিন্তা ব্যাপৃত থাকবে তাতেই অন্তর উপস্থিত থাকবে। কাজেই নামাযে অন্তর উপস্থিত করার একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে, চিন্তাকে নামাযের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া। চিন্তা নামাযের দিকে ঘুরবে না, যে পর্যন্ত প্রকাশ না পায় যে, প্রার্থিত লক্ষ্য নামাযের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ এ বিষয়ের পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, আখেরাত উত্তম, চিরস্থায়ী ও প্রার্থিত লক্ষ্য। নামায এ লক্ষ্য অর্জনের উপায়। এ বিষয়কে দুনিয়ার নিকৃষ্টতার সাথে যোগ করলে উভয়ের সমষ্টি দ্বারা নামাযে অন্তরের উপস্থিতি অর্জিত হবে। তুমি যখন কোন শাসনকর্তার কাছে যাও, যে তোমার উপকার ও ক্ষতি করতে পারে না, তখন এ ধরনের বিষয় চিন্তা করলে অন্তর হাযির হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সকল প্রকার লাভ লোকসান এবং পৃথিবীর ও আকাশের রাজত্বের অধিকারী আল্লাহর সাথে মোনাজাতের সময় যদি তোমার অন্তর উপস্থিত না হয়, তবে এর কারণ তোমার ঈমানের দুর্বলতা ছাড়া অন্য কিছুকে মনে করো না। এ অবস্থায় তোমার উচিত ঈমান শক্তিশালী করার চেষ্টায় ব্রতী হওয়া। এর উপায় পূর্ণরূপে অন্যত্র বর্ণনা করা হবে।

অন্তরের উপস্থিতির পর ফাহমের কারণ হচ্ছে চিন্তাকে সদা ব্যাপৃত রাখা এবং অর্থোপলব্ধির দিকে ঘুরিয়ে দেয়া। এর উপায় তাই, যা অন্তর উপস্থিত করার উপায়। এর সাথেই চিন্তার প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে এবং যেসব কুমন্ত্রণা অন্তরকে বিমুখ করে দেয়, সেগুলো দূর করতে সচেষ্ট হতে হবে। এ ধরনের কুমন্ত্রণা দূর করার প্রতিকার হচ্ছে এগুলোর উপকরণ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, অর্থাৎ যেসব উপকরণের দিকে কুমন্ত্রণা ধাবিত হয়, সেগুলো নিজের কাছে না রাখা। কেননা, মানুষ যে বস্তুকে প্রিয় মনে করে, তার আলোচনা বেশী করে। এ আলোচনা নিশ্চিতই অন্তরে ভীড় সৃষ্টি করে। এ কারণেই যারা গায়রুল্লাহকে ভালবাসে, তাদের নামায কুমন্ত্রণা মুক্ত হয় না।

দু'টি বিষয় জানার কারণে অন্তরে তাযীম সৃষ্টি হয়- (১) আল্লাহ্ তাআলার প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের পরিচয় লাভ করা, যা মূল ঈমান। কেননা, যেব্যক্তি আল্লাহর মাহাত্ম্যের বিশ্বাসী হবে না, তার মন আল্লাহর সামনে নত হবে না। (২) নিজের হেয়তা ও নীচতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। এ দু'টি বিষয় জানা থেকে অনুনয়, বিনম্র ভাব ও খুশু জন্ম লাভ করে, যাকে তাযীম বলা হয়। যে পর্যন্ত নিজের নীচতা জ্ঞান আল্লাহ তাআলার প্রতাপ জ্ঞানের সাথে যুক্ত না হয়, সে পর্যন্ত তাযীম ও খুশুর অবস্থা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় না।

হয়বত ও ভয় আল্লাহ তাআলার কুদরত, প্রাবল্য ও তাঁর ইচ্ছা প্রযোজ্য হওয়ার জ্ঞান থেকে জন্ম লাভ করে। অর্থাৎ, একথা হৃদয়ঙ্গম করবে, যদি আল্লাহ্ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে ধ্বংস করে দেন, তবে তাঁর রাজত্ব বিন্দুমাত্রও হ্রাস পাবে না। এর সাথে পয়গম্বর ও

ওলীগণের উপর আগত বিপদাপদ সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করবে। মোট কথা, আল্লাহ তাআলার পরিচয় মানুষ যত বেশী লাভ করবে, হয়বত বা ভয়ও ততই বেশী হবে।

'রাজা' তথা আশার কারণ এই, মানুষ আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ, কৃপা ও নেয়ামতকে চিনবে এবং নামাযের কারণে তিনি যে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন তা সত্য মনে করবে। যখন ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর কৃপার জ্ঞান অর্জিত হবে, তখন উভয়ের সমষ্টি মানুষের অন্তরে নিশ্চিতই আশার সৃষ্টি করবে।

'হায়া' তথা লজ্জা-শরম সৃষ্টি হওয়ার উপায় হচ্ছে, মানুষ এবাদতে নিজেকে ক্রটিকারী মনে করবে এবং বিশ্বাস করবে, আল্লাহ্ তাআলার যথার্থ হক আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে না। সাথে সাথে একথাও জানবে, অন্তরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কুমন্ত্রণা সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলা অবগত আছেন। এসব জ্ঞান থেকে নিশ্চিতরূপে যে অবস্থা উৎপন্ন হবে, তাকেই হায়া বলা হয়।

অতএব উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ের মধ্য থেকে কোন একটি অর্জন করতে হলে তার কারণ জানতে হবে। কেননা, কারণ জানা হয়ে গেলে তার প্রতিকার আপনা আপনি জানা যায়। উপরে বর্ণিত জ্ঞানসমূহ একীনের স্তরে পৌঁছে যেতে হবে। তাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারবে না। এগুলো অন্তরে প্রবলও হতে হবে। একীনের অর্থ যে সন্দেহ না থাকা এবং অন্তরে প্রবল হওয়া, একথা আমরা এলেম অধ্যায়ে লেখে এসেছি। যে পরিমাণে একীন হয়, সেই পরিমাণে অন্তর খুশু করে। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সাথে কথা বলতেন এবং আমরা তাঁর সাথে কথা বলতাম, কিন্তু নামাযের সময় এসে গেলে তিনি যেন আমাদেরকে চিনতেন না এবং আমরাও তাঁকে চিনতাম না। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ হে মূসা! তুমি যখন আমাকে স্মরণ কর, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝেড়ে নাও এবং খুশু ও স্থিরতা সহকারে থাক। যখন আমার যিকির কর তখন জিহ্বাকে অন্তরের পেছনে রাখ। যখন আমার সামনে দাঁড়াও, তখন লাঞ্ছিত দাসের মত দাঁড়াও। সাচ্চা মুখে ও ভীত অন্তরের সাথে আমার কাছে মোনাজাত কর। আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-এর প্রতি আরও ওহী প্রেরণ করেন– হে মূসা! তোমার উম্মতকে বলে দাও,

তারা যেন আমাকে স্মরণ না করে। কেননা, আমি নিজেকে কসম দিয়েছি, যে কেউ আমাকে স্মরণ করবে, আমি তাকে স্মরণ করব। সুতরাং তোমার উম্মত আমাকে স্মরণ করলে আমি তাদেরকে লানত সহকারে স্মরণ করব। এ হচ্ছে গাফেল নয়– এমন গোনাহগারের অবস্থা। যদি গাফিলতি ও গোনাহ উভয়টি একত্রিত হয়, তবে অবস্থা কি হবে?

আমরা উপরে যেসব বিষয় উল্লেখ করেছি, এগুলোতে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রূপ। কতক মানুষ এমন গাফেল যে, নামায সবগুলো পড়ে, কিন্তু এক মুহূর্তও অন্তর উপস্থিত হয় না। আবার কেউ কেউ এমন, নামায পূর্ণরূপে পড়ে এবং এক মুহূর্তও অন্তর অনুপস্থিত থাকে না; বরং মাঝে মাঝে চিন্তাকে এমনভাবে নামাযে নিয়োজিত রাখে, তাদের কাছে কোন দুর্ঘটনা হয়ে গেলেও তারা তার খবর রাখেন না। এ কারণেই মুসলিম ইবনে ইয়াসার নামাযে দাঁড়িয়ে মসজিদের একাংশের পতন ও এ কারণে লোকজনের জড়ো হওয়ার বিষয় জানতে পারেননি। কোন কোন মনীষী দীর্ঘ দিন পর্যন্ত নামাযের জামাআতে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু কোন সময় চিনতে পারলেন না, ডান দিকে কে এবং বাম দিকে কে দাঁড়িয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অন্তরের স্ফুটন দু'মাইল দূর থেকে শুনা যেত। কিছু লোকের মুখমন্ডল নামাযের সময় ফ্যাকাসে হয়ে যেত এবং স্কন্ধ কাঁপতে থাকত। এসব ব্যাপার মোটেই অবাস্তব নয়। কেননা, দুনিয়াদারদের ধমক এবং দুনিয়ার বাদশাহদের ভয়ে এর চেয়েও অনেক বেশী ভীতকম্পিত হতে দেখা যায়। অথচ তারা অক্ষম ও দুর্বল। তাদের কাছ থেকে যা পাওয়া যায়, তাও নগণ্য ও তুচ্ছ। এমনকি, কোন ব্যক্তি বাদশাহ অথবা মন্ত্রীর কাছে গিয়ে কোন নালিশ সম্পর্কে কথা বলার পর যখন চলে আসে, তখন যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয়– বাদশাহের আশেপাশে কারা ছিল এবং বাদশাহের পোশাক কি ছিল, তবে সব কিছুতেই বলবে, জানি না। কেননা, নিজের কাজে মগ্ন থাকার কারণে বাদশাহের পোশাক অথবা আশেপাশের লোকজনকে দেখার কোন ফুরসতই তার ছিল না। যেহেতু প্রত্যেকেই তার আমলের বিভিন্ন অংশ পাবে, তাই নামাযে প্রত্যেকের অংশ ততটুকুই হবে, যতটুকু সে ভয়, খুশু ও তাযীম করবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা দেখেন অন্তর– বাহ্যিক নড়াচড়া নয়। এজন্যেই কোন কোন সাহাবী বলেন ঃ কেয়ামতে মানুষ সেই অবস্থায় উত্থিত হবে, যা তার নামাযে হবে। অর্থাৎ নামাযে যে

পরিমাণ প্রশান্তি, স্থিরতা ও আনন্দ হবে, কেয়ামতে সে সেই পরিমাণে প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ করবে। সাহাবায়ে কেরাম ঠিকই বলেছেন। কেননা, মানুষের হাশর সেই অবস্থায় হবে, যে অবস্থায় সে মরবে। আর মানুষ মরবে সেই অবস্থায়, যে অবস্থায় সে জীবন যাপন করেছে। এতে তার অন্তরের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে– বাহ্যিক শারীরিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। কেননা, অন্তরের গুণাবলী দ্বারাই পরকালে আকার আকৃতি তৈরী করা হবে এবং নাজাত সে-ই পাবে, যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে যাবে। আল্লাহ স্বীয় কৃপায় আমাদেরকেও তওফীক দিন।

অন্তরের উপস্থিতির সহায়ক ব্যবস্থা

প্রকাশ থাকে যে, মুমিনের জন্য জরুরী আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভক্তি রাখা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর কাছে প্রত্যাশা রাখা এবং আপন ত্রুটির জন্য অনুতপ্ত হওয়া । অর্থাৎ, ঈমানের পর এসব অবস্থা থেকে মুমিন পৃথক হবে না, যদিও এগুলোর শক্তি তার বিশ্বাসের শক্তি অনুযায়ী হবে। সুতরাং নামাযের মধ্যে এসব অবস্থার অনুপস্থিতি এ কারণেই হবে যে, নামাযীর চিন্তা বিক্ষিপ্ত, ধ্যান বিভক্ত, অন্তর মোনাজাতে অনুপস্থিত এবং মন নামায থেকে গাফেল। নামায থেকে গাফিলতি কুমন্ত্রণার কারণে হয়, যা মনের উপর নেমে এসে মনকে ব্যাপৃত করে দেয়। এমতাবস্থায় কুমন্ত্রণা দূর করাই অন্তরের উপস্থিতি লাভের উপায়। কোন বস্তু তখনই দূর হয়, যখন তার কারণ দূর হয়। তাই এখন কুমন্ত্রণার কারণ জানা দরকার। কুমন্ত্রণার কারণ হয় কানে ও চোখে পড়ে এমন কোন বিষয় হবে, না হয় কোন গোপন বিষয় হবে। কানেও চোখে পড়ে এমন বস্তুও মাঝে মাঝে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। চিন্তা এসব বস্তুর পেছনে পড়ে সেগুলো থেকে অন্য বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হয়। উচ্চ মর্যাদাশীল ও উচ্চ সাহসী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের সামনে কোন বস্তু থাকলে তা তাকে গাফেল করে না, কিন্তু দুর্বল ব্যক্তির চিন্তা বিক্ষিপ্ত না হয়ে পারে না। এর প্রতিকার হচ্ছে এ ধরনের বস্তুর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা– চোখ বন্ধ করে অথবা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নামায পড়া। এর জন্যে প্রাচীরের কাছে নামায পড়াও উত্তম, যাতে দৃষ্টির দূরত্ব দূরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে। রাস্তায়, চিত্র ও কারুকার্যের স্থানে এবং রঙ্গিন বিছানায় নামায পড়া উচিত নয়। এ কারণেই আবেদগণ ক্ষুদ্র অন্ধকার

প্রকোষ্ঠে নামায পড়তেন, যাতে কেবল সেজদা করার স্থান সংকুলান হত। শক্তিশালী আবেদগণ মসজিদে উপস্থিত হয়ে দৃষ্টি নত করে নিতেন এবং দৃষ্টিকে সেজদার জায়গার বাইরে যেতে দিতেন না। ডান ও বামের মুসল্লীকে না চেনাই ছিল তাদের মতে নামাযের পূর্ণতা। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সেজদার জায়গায় না তরবারি রাখতেন, না কালামে মজীদ। কিছু লেখা পেলে তা মিটিয়ে দিতেন।

কুমন্ত্রণার কারণ কোন গোপন বিষয় হলে সেটা খুবই দুরূহ ব্যাপার। কেননা, যেব্যক্তির চিন্তা জাগতিক ব্যাপারাদিতে ছড়িয়ে পড়ে, তার চিন্তা এক বিষয়ে সীমিত থাকে না; বরং সর্বদাই এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ের দিকে ধাবমান থাকে। দৃষ্টি নত করা তার জন্যে যথেষ্ট হয় না। এরূপ কুমন্ত্রণা দূর করার উপায় হচ্ছে মনকে জোর করে নামাযে পঠিত বিষয় বুঝার মধ্যে লাগিয়ে রাখা এর জন্য সহায়ক বিষয়। নিয়ত বাঁধার পূর্বে মনকে নতুন করে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেবে, আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার বিপদ এবং মৃত্যু পরবর্তী ভয়ংকর অবস্থা মনের সামনে পেশ করবে। মনকে সকল চিন্তার বিষয় থেকে মুক্ত করবে এবং এমন কোন ব্যস্ততা রাখবে না, যার দিকে মন আকৃষ্ট হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওসমান ইবনে আবী শায়বাকে বলেছিলেন–

انى نسيت ان اقول لك ان تخمر القدر الذى فى البيت فانه لاينبغى ان يكون فى البيت شئ يشغل الناس عن صلواتهم -

অর্থাৎ, আমি তোমাকে গৃহের হাঁড়ির মুখ বন্ধ করার কথা বলতে ভুলে গেছি। কেননা, গৃহে এমন বস্তু না থাকা উচিত, যা মানুষকে নামাযে বাধা দেয়।

মোট কথা, এগুলো হচ্ছে চিন্তা স্থির রাখার উপায়। যদি এসব ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর চিন্তা স্থির না হয়, তবে রোগের মূলোৎপাটনকারী জোলাব ছাড়া নাজাতের কোন পথ নেই। জোলাব এই যে, যেসব বিষয় মনকে অন্যত্র ব্যাপৃত করে দেয় এবং অন্তরের উপস্থিতি বিনষ্ট করে, সেগুলো থেকে হাত গুটিয়ে নেবে এবং সেগুলোর খাহেশ সম্পূর্ণ ছিন্ন করে দেবে। কেননা, যে বিষয় মানুষকে নামাযে বাধা দেয়, সে বিষয় তার ধর্মের বিপরীত এবং দুশমন ইবলীসের বাহিনী। কাজেই একে

সম্পূর্ণ দূর না করে বাধা দিতে থাকা অধিক ক্ষতিকর। একে আলাদা করে দেয়ার মধ্যেই এর কুপ্রভাব থেকে মুক্তি নিহিত। বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সঃ)-এর কাছে আবু জহম দু'পাড়বিশিষ্ট একটি কাল চাদর প্রেরণ করলে তিনি তা পরিধান করে নামায পড়লেন। নামাযের পর চাদরটি খুলে বললেন ঃ এটি আবু জহমের কাছে নিয়ে যাও। সে আমাকে নামায থেকে গাফেল করে দিয়েছে। আমাকে আমার সাদা চাদর এনে দাও। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জুতায় নতুন চামড়ার টুকরা সংযোজনের আদেশ দেন। এর পর নামাযে তার দিকে তাকান। নামায শেষে তিনি টুকরাটি খুলে পুরাতন টুকরা সংযোজন করতে বলেন। একবার তিনি এক জোড়া জুতা পরিধান করলেন, যা তাঁর কাছে ভাল মনে হল। তিনি সেজদা করলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার পরওয়ারদেগারের সামনে অনুনয় বিনয় করেছি, যাতে তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ না হন। এর পর জুতা জোড়াটি বাইরে নিয়ে প্রথমে যে প্রার্থী পেলেন, তাকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে আদেশ করলেন ঃ আমার জন্যে নরম চামড়ার পুরাতন জুতা জোড়া ক্রয় কর। অতঃপর সে জোড়াই তিনি পরিধান করলেন। হারাম হওয়ার পূর্বে একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) সোনার আংটি পরে মিম্বরে উঠলেন, এরপর সেটি নিক্ষেপ করে বললেন ঃ এটি আমাকে ব্যাপৃত রেখেছে। কখনও এটি দেখি এবং কখনও তোমাদেরকে দেখি। বর্ণিত আছে, হযরত আবু তালহা (রাঃ) তাঁর বাগানে নামায পড়লেন। একটি বেগুনী রংয়ের পাখী বৃক্ষের উপর যাওয়ার জন্যে উড়ল। পাখীটি তাঁর কাছে খুবই সুন্দর মনে হল। তিনি এক মুহূর্ত সেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফলে কত রাকআত নামায পড়লেন তা মনে রইল না। এর পর রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে এ ফেতনার কথা উল্লেখ করলেন এবং আরজ করলেন ঃ আমি বাগানটি সদকা করে দিলাম। যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করুন। অন্য এক ব্যক্তির কথা বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর বাগানে নামায পড়ছিলেন। বাগানের বৃক্ষসমূহ ফলভারে নুয়ে পড়ছিল। এ দৃশ্য নামাযের মধ্যেই তার কাছে খুব ভাল লাগল। ফলে তিনি নামাযের রাকআত সংখ্যা ভুলে গেলেন। বিষয়টি তিনি হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করে আরজ করলেন ঃ বাগানটি সদকা করে দিলাম। একে আল্লাহর পথে ব্যয় করুন। হযরত ওসমান (রাঃ) বাগানটি পঞ্চাশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলেন।

মোট কথা, পূর্ববর্তী মনীষীগণ চিন্তার মূল কর্তন করার জন্যে এসব উপায় অবলম্বন করতেন। বাস্তবে চিন্তার কারণের মূলোৎপাটন করার পদ্ধতি এটাই। এছাড়া অন্য কোন কৌশল উপকারী হবে না। কেননা, মনকে নরমভাবে স্থির করার যে কথা আমরা লেখেছি, তা দুর্বল চিন্তার ক্ষেত্রে উপকারী। কিন্তু খাহেশ ও চিন্তা জোরদার হলে তাতে তা উপকারী নয়; বরং খাহেশ তোমাকে টানবে এবং তুমি খাহেশকে টানবে। শেষ পর্যন্ত খাহেশই প্রবল হবে এবং সমগ্র নামায এই দ্বন্দ্বের মাঝে অতিবাহিত হয়ে যাবে। এর দৃষ্টান্ত এই, এক ব্যক্তি বৃক্ষের নীচে বসে তার চিন্তা সাফ রাখতে চায়। কিন্তু বৃক্ষের উপর পাখীরা বসে চেঁচামেচি করে তার চিন্তা বিক্ষিপ্ত করে দেয়। লোকটি একটি লাঠি হাতে নিয়ে পাখীদেরকে উড়িয়ে দেয় এবং পুনরায় আপন চিন্তায় মশগুল হয়। পাখীরা আবার এসে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। এমতাবস্থায় কেউ এসে লোকটিকে বলল ঃ যে কৌশল তুমি অবলম্বন করেছ তা কখনও সফল হবে না। যদি তুমি এ থেকে নিষ্কৃতি চাও, তবে বৃক্ষটি উৎপাটিত করে দাও। খাহেশরূপী বৃক্ষের অবস্থাও তদ্রূপ। এর শাখা-প্রশাখা যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন এর উপর চিন্তা পাখীদের ন্যায় দাপাদাপি করে অথবা আবর্জনার উপর মাছির ন্যায় ভন্‌ভন্ করে। মাছিকে তাড়িয়ে দিলে আবার আসে। মনের কুমন্ত্রণাও তেমনি। খাহেশ অনেক। মানুষ এ থেকে খুব কম মুক্ত। সবগুলোর মূল শিকড় এক, অর্থাৎ দুনিয়ার মহব্বত। যার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত রয়েছে এবং যে দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতি আগ্রহান্বিত, তার নামাযে নিবিষ্টতার স্বচ্ছ আনন্দ অর্জিত হওয়ার আশা করা উচিত নয়। তবুও তার মোজাহাদা তথা চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত, যেভাবেই হোক মনকে নামাযের দিকে ফেরানো এবং চিন্তার কারণসমূহ হ্রাস করা উচিত। এ ওষুধ তিক্ত এবং মনের কাছে বিস্বাদ। কিন্তু রোগ পুরাতন ও দুরারোগ্য হয়ে গেছে। এমনকি, বুযুর্গগণ এমন দু'রাকআত নামায পড়ার ইচ্ছা করেছেন, যাতে দুনিয়ার বিষয়সমূহ মনে না আসে। কিন্তু এটা সম্ভবপর হয়নি। তাঁরাই যখন এরূপ দু'রাকআত নামায পড়তে সক্ষম হলেন না, তখন আমাদের মত লোক এটা আশা করতে পারে কি? আমরা যদি কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত অর্ধেক কিংবা তিন ভাগের এক ভাগ নামাযও পাই, তবে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি, যারা সৎকর্মের সাথে কুকর্মও মিশ্রিত করে দিয়েছে। মোট কথা, দুনিয়ার চিন্তা ও পরকালের সাহস এমন, যেমন তেলপূর্ণ পেয়ালায়

পানি ঢাললে যে পরিমাণ পানি পেয়ালায় যাবে, সেই পরিমাণ তেল নিশ্চিতই বের হয়ে পড়বে। উভয়ের একত্র মিলন সম্ভবপর হবে না।

নামাযের প্রত্যেক রোকন ও শর্তের জরুরী বিষয়

আখেরাত কাম্য হলে নামাযের শর্ত ও রোকনসমূহে আমরা যেসকল বিষয় লেখছি, সেগুলো থেকে গাফেল না হওয়া অত্যাবশ্যক। নামাযের শর্ত অর্থাৎ যেসকল কাজ নামাযের পূর্বে হয়, সেগুলো এই ঃ ওয়াক্ত, পবিত্রতা অর্জন, উলঙ্গতা দূরীকরণ, কেবলামুখী হওয়া, সোজা দাঁড়ানো এবং নিয়ত করা। সুতরাং যখন মুয়াযযিনের আযান শুন, তখন অন্তরে কেয়ামতের ডাকের ভয়াবহতা উপস্থিত কর। আযান শুনামাত্রই বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে তাতে সাড়া দেয়ার জন্যে তৎপর হয়ে যাও এবং তাড়াতাড়ি কর। কেননা, যারা মুযাযযিনের আযান শুনে তাড়াতড়ি করবে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে সোহাগ ভরে ডাকা হবে। আযান শুনার পর তুমি তোমার অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর। যদি তা আনন্দ উল্লাসে পূর্ণ পাও, তবে জেনে রাখ, বিচার দিবসে তুমি সুসংবাদ ও সাফল্যের আওয়াজ শুনতে পাবে।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ ارحنا يا بلال

অর্থাৎ, হে বেলাল! নামায ও আযান দ্বারা আমাকে সুখ ও স্বস্তি দান কর। কেননা, নামাযের মধ্যেই ছিল রসূলে করীম (সাঃ)-এর চোখের শীতলতা।

পবিত্রতা সম্পর্কে কথা এই, তুমি যখন নামাযের জায়গা পাক করে নাও, এর পর কাপড় ও বাহ্যিক দেহ পবিত্র করে নাও, তখন অন্তরের পবিত্রতা থেকে গাফেল হয়ো না। এ পবিত্রতার জন্যে তওবা ও গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হওয়ার চেষ্টা কর। ভবিষ্যতে এসব গোনাহ না করার জন্যে কৃতসংকল্প হও। এসব বিষয় দ্বারা অন্তরকে অবশ্যই পাক করে নাও।। কেননা, অন্তর আল্লাহ্ তাআলার দেখার স্থান।

উলঙ্গতা দূরীকরণের অর্থ এরূপ মনে কর, বাহ্যিক দেহের যে অংশের উপর মানুষের দৃষ্টি পড়ে সেটা যখন আবৃত করবে, তখন অন্তরের যেসকল দোষত্রুটি পরওয়ারদেগার ব্যতীত কেউ জানে না, সেগুলো আবৃত করবে না কেন? সুতরাং সেসব দোষ অন্তরে উপস্থিত কর, সেগুলো আবৃত

করার জন্যে নফসকে অনুরোধ কর। এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর, আল্লাহ তাআলার দৃষ্টি থেকে এসব দোষ গোপন থাকতে পারে না। কিন্তু অনুতাপ, লজ্জা ও ভয় এগুলোর জন্যে কাফফারা হয়ে যায়। এসব দোষ অন্তরে উপস্থিত করার ফলস্বরূপ তোমার অন্তরে লক্কায়িত ভয় ও লজ্জা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তখন নফস নত হবে এবং অনুতাপে অন্তর আচ্ছন্ন হবে। তুমি আল্লাহ্ তাআলার সামনে এমনভাবে দণ্ডায়মান হবে, যেমন পাপী, দুশ্চরিত্র ও পলাতক গোলাম তার কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে প্রভুর সামনে নতমস্তকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দণ্ডায়মান হয়।

কেবলামুখী হওয়ার অর্থ তো তোমার বাহ্যিক মুখমণ্ডল সব দিক থেকে ফিরিয়ে আল্লাহ্ তাআলার কাবা গৃহের দিকে করে নেবে। এখন তুমি কি মনে কর, সকল কাজ কারবার থেকে অন্তরকে ফিরিয়ে আল্লাহ্র আদেশের দিকে করা কাম্য নয়? কখনও এরূপ মনে করো না; বরং মনে কর, এটা ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য নয়। বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম সবগুলো অন্তরকে আন্দোলিত করার জন্যে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত ও একদিকে স্থির রাখার জন্যে। ফলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্তরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। সুতরাং দেহের প্রতি মনোযোগ দেয়ার সাথে সাথে অন্তরের প্রতিও মনোযোগ দরকার। অর্থাৎ, মুখমণ্ডল যেমন কাবা গৃহের দিকে থাকবে, যা মুখমণ্ডলকে অন্য সকল দিক থেকে না ফিরিয়ে হতে পারে না, তেমনি অন্তরও আল্লাহ তাআলার দিকে থাকবে, যা অন্তরকে সবকিছু থেকে মুক্ত না করে হতে পারে না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন বান্দা নামাযে দাঁড়ায় এবং তার খাহেশ, মুখমণ্ডল ও অন্তর আল্লাহ তাআলার দিকে থাকে, তখন সে জন্মদিনের মতই নিষ্পাপ অবস্থায় নামায খতম করে। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য এই, দেহ ও মন দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সামনে নির্দেশ পালনের জন্য দাঁড়াবে। এমতাবস্থায় যে মাথা সমস্ত অঙ্গের মধ্যে সর্বাধিক উচ্চ, তা নত ও বিনম্র হওয়া উচিত । মাথার উচ্চতা দূর করার উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত, অন্তরে অনুনয় ও বিনয়ভাব অবশ্যই থাকবে। নামাযে দাঁড়ানো দ্বারা কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ার কথা স্মরণ করবে । মনে করবে, যেন তুমি আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে আছ এবং তিনি তোমাকে দেখছেন। যদি তুমি এর যথার্থ প্রতাপ উপলব্ধি করতে না পার, তবে এমনভাবে দাঁড়াও, যেমন দুনিয়ার কোন বাদশাহের সামনে দাঁড়িয়ে থাক; বরং

যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক ততক্ষণ এটা মনে কর, তোমাকে তোমার পরিবারের একজন খুব সাধু ব্যক্তি দেখে যাচ্ছে কিংবা যাকে তুমি তোমার সৎকর্মপরায়ণতা দেখাতে চাও, সে তোমাকে দেখছে। কেননা, এরূপ কোন ব্যক্তি দেখলে তোমার হাত পা স্থির ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলে থাকে, যাতে সে বলে, তুমি নামাযে বিনয় ও নম্রতা কর। অথচ সে প্রকৃতপক্ষে অক্ষম। সুতরাং একজন অক্ষম ব্যক্তির সামনে যখন তোমার মনের এই অবস্থা হয়, তখন মনকে এই বলে শাসাও, তুই আল্লাহ তা'আলার মারেফত ও মহব্বত দাবী করিস। তাঁর সামনে এরূপ করতে তোর লজ্জা হয় না ? তুই একজন সামান্য বান্দার প্রতি সম্মান দেখাস এবং তাকে ভয় করিস, কিন্তু আল্লাহকে ভয় করিস না। এ কারণেই হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন, লজ্জা কিভাবে হয়, তখন তিনি বললেন ঃ এমনভাবে লজ্জা কর, যেমন তোমার পরিবারের কোন সাধু ব্যক্তির সামনে লজ্জা করে থাক।

নিয়তের মধ্যে অন্তরে একথা পাকাপোক্ত করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা নামাযের যে আদেশ করেছেন তা আমি মেনে নিয়েছি। এর পর আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ, তাঁর আযাবের ভয় এবং সওয়াবের প্রত্যাশা সহকারে নামায পূর্ণরূপে পড়া, নামাযের পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত থাকা এবং একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সব কাজ করার সংকল্প করা উচিত। এক্ষেত্রে তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করবে। বেআদব ও গোনাহগার হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে মোনাজাত করার অনুমতি দিয়েছেন। কার সাথে এবং কিভাবে মোনাজাত করছ, তা লক্ষ্য করবে। এমতাবস্থায় তোমার ঘর্মাক্ত কলেবর কম্পমান এবং ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া উচিত।

মুখে আল্লাহু আকবার বলার সময় অন্তর যেন এ উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে। অর্থাৎ, অন্তরে যদি অন্য কোন বস্তুকে আল্লাহ অপেক্ষা বড় মনে কর, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমার মিথ্যাবাদী হওয়ার সাক্ষ্য দেবেন, যদিও তোমার মৌখিক উক্তিটি সত্য হয়। যেমন, সূরা মুনাফিকুনে মোনাফেকদের মৌখিক সত্য উক্তি সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ সাক্ষ্য দেন, মোনাফেকরা মিথ্যাবাদী। অর্থাৎ, তারা অন্তরে রেসালত স্বীকার করে না। কেবল মুখে বলে, আপনি আল্লাহর রসূল।

শুরুর দোয়ায় তুমি বল–

إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ -

অর্থাৎ, আমি আমার মুখ তাঁর দিকে করলাম, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

এখানে শরীরের মুখ উদ্দেশ্য নয়। কেননা, শরীরের মুখ তো তুমি কেবলার দিকে করেই রেখেছ। আল্লাহ কেবলার মধ্যে বেষ্টিত নন। হাঁ, অন্তরের মুখকে তুমি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টার দিকে করতে পার। এখন চিন্তা কর, তোমার অন্তরের মুখ বাড়ী-ঘর, বাজার ও যাবতীয় কাজ-কারবারে রয়েছে, না আল্লাহ তা'আলার দিকে নিবদ্ধ রয়েছে ? খবরদার, নামাযের শুরুতেই মিথ্যা ও বানোয়াটকে প্রশ্রয় দিয়ো না। অতএব চেষ্টা করা উচিত যেন অন্তরের মনোযোগ আল্লাহ তা'আলার দিকেই থাকে। এটা সমগ্র নামাযে না পারলে যখন এ কলেমা মুখে বল, তখন তো কথাটা সত্য হওয়া উচিত। আর যখন মুখে বল حَنِيْفًا مُّسْلِمًا একাগ্রভাবে মুসলমান হয়ে– তখন মনে মনে চিন্তা কর, মুসলমান সে ব্যক্তি, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। তুমি বাস্তবে এরূপ না হলে একথায় মিথ্যাবাদী হবে। সুতরাং এরূপ হওয়ার জন্যে এখনই চেষ্টা কর। আর যখন বল وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ আমি মুশরিকদের মধ্য হতে নই, তখন অন্তরে গোপন শেরকের কথা চিন্তা কর। কেননা–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ আশা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং পালনকর্তার এবাদতে যেন কাউকে শরীক না করে।

এ আয়াতখানি সে ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে তার এবাদত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও মানুষের প্রশংসা কামনা করে। সুতরাং এ শেরক থেকে যত্ন সহকারে বেঁচে থাকা উচিত। আর যখন তুমি মুখে